সাম্রাজ্য বিস্তার, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ

ডক্টর পরিমল রায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২



সাম্রাজ্য-বিস্তার, স্বাধীনতা-সংগ্রাম
ও
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ

ভূমিকা
শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ., বি. এল.,
শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীপরিমল রায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)
ভূতপূর্ব শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ও
রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছি-বিভাগের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন অর্থনীতি-বিষয়ক আধিকারিক

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

দাম ঃ পাঁচ টাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ অগস্ট, ১৯৬৩

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীগৌরহরি মাইতি কর্তৃক বাণী-মুদ্রণ ৯এ
মনমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিষয়সূচী

ভূমিকা

এই গ্রন্থখানির লেখক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এবং যেমন অর্থশাস্ত্রে তেমনই রাজনীতি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। তিনি রাষ্ট্রসংঘের Trusteeship Council-এরও উপদেষ্টা ছিলেন। বিশেষজ্ঞের লেখা প্রায়ই সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিশ্ব-রাজনৈতিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তস্বরূপ এই ছোট বইটি যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে তাহাতে সাধারণ পাঠকবর্গও অক্লেশে এবং সানন্দে ইহা পড়িতে পারিবে মনে করি। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক পাঠকের মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে এই কাহিনীর শেষ কোথায়? বাস্তবিক যতদিন জগতের সকল জাতি ও রাষ্ট্র পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করিবে এবং সকল রাষ্ট্রই ভিতরে ও বাহিরে বলপ্রয়োগে আস্থাহীন হইয়া নিখিল মৈত্রীই শ্রেষ্ঠ কাম্য মনে না করিবে আর পারস্পরিক সকল বিরোধের মীমাংসার ভার রাষ্ট্রসংঘের উপর অর্পণ করিতে না পারিবে, ততদিন আঞ্চলিক জোট এবং আণবিক শস্ত্রের প্রতিযোগিতাই মুখ্য সাধন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এক সম্ভাবিত বিরাট বিয়োগান্ত নাটকের অংকের পর অংকের অভিনয়ই চলিতে থাকিবে।

১৯৩৬ সালে জনৈক ইউরোপের ইতিহাসলেখক তাঁহার ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিয়াছিলেন এই বলিয়া—

"Europe, then, has now reached a point at which it would seem, as never so clearly in past history, that two alternative and sharply contrasted destinies await her: She may travel down

the road to a new war or, overcoming passion, prejudice, and hysteria, work for a permanent organization of peace. In either case the human spirit is armed with material power. The developing miracle of science is at our disposal to use or abuse, to make or to mar. With science we may lay civilization in ruins or enter into a period of plenty and well-being the like of which has never been experienced by mankind."

আজ ১৯৬৩ সালে শুধু Europe-এর স্থলে World শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই উক্তির পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে।

২৮।৬।১৯৬৩

শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নিবেদন

সাম্রাজ্যলালসায় বিভিন্ন জাতি ও দেশ কিভাবে বিজিত ও শৃঙ্খলিত হয়েছে, জাতীয়তার উন্মেষে কবে কেমন করে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং ক্রমশঃ প্রবল ও ব্যাপ্ত হয়ে জয়ের পথে অগ্রসরণ করেছে, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এই বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ও কি অংশ গ্রহণ করেছে, এই পরস্পর সম্বদ্ধ অথচ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিষয়টি এত বৃহৎ যে ক্ষুদ্রপরিসর গ্রন্থে তার সম্যক্ ব্যাপক আলোচনা সম্ভবপর নয়, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও নয়। রেখাঙ্কনের দ্বারা চিত্রকর যেমন করে ক্ষুদ্রপটে প্রকৃতির বিশালত্ব ও বর্ণচ্ছটাকে ফুটিয়ে তুলে, আমার চেষ্টা অনেকটা সেই ধরনের।

বর্তমান জগৎ অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। ঘটনাস্রোতের সঙ্গে সমতা রক্ষা করা যে কোন লেখকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। তত্রাচ পুস্তকটির রচনাকালে এবং রচনা ও মুদ্রণের ব্যবধানে সঙ্ঘটিত পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সেগুলো পাদ-টীকায় যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ছাপা প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় লাওসে পুনরায় বিশৃঙ্খলার সূচনার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু তার ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও গতি সম্বন্ধে তখনও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে না পেরে নূতন পরিস্থিতির কোন আলোচনা করি নাই। গোলযোগের পুনরাবৃত্তির মূলে ঠিক একই কারণ বিদ্যমান। গোড়ায় গলদ দূর না হলে, গৃহবিবাদ এমনি করে বারবার মাথা চাড়া দিবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ছাপা শেষ হবার পর যে সকল অবস্থান্তর ঘটেছে তাদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে

অসম্ভব, সামান্য দু'একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে ক্ষান্ত হতে হচ্ছে। প্রথমতঃ, ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লাই-বিরিয়া ও ইথিওপিয়ার অভিযোগের প্রথম দফা বিচারে এরূপ সাব্যস্ত হয়েছে (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২) যে মামলাটি শুনবার ও বিচার করবার পূর্ণ অধিকার আন্তর্জাতিক আদালতের আছে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম ইরিয়ানের প্রশাসন বর্তমান বৎসরের মে মাসের প্রথম ভাগে ইন্দোনেশিয়ার গভর্নমেণ্টের নিকট অন্তর্বর্তী-কালের জন্য হস্তান্তরিত হয়েছে; ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত নির্ধারণের জন্য গণভোট গৃহীত হবে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি।

আন্তর্জাতিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই কাম্য। সুখের বিষয় আমাদের দেশেও এ সম্পর্কে শিক্ষিত জন-সাধারণের যথেষ্ট কৌতূহল লক্ষ্যগোচর হচ্ছে। লীগের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ছিল। কিন্তু ইউ. এন. ও.-র ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ ও ঔৎসুক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর বিশেষ করে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে আমাদের ভারতবাসীদের আগ্রহাতিশয় সর্বজনবিদিত। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশ একান্ত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী বলে মনে করি। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল নূতন কিছু বলবার ঝোঁক নিয়ে বইটি লিখিনি। মৌলিক গবেষণার কোন দাবি এতে নেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘে কার্যকালে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে এবং অন্যের রচনা ও সরকারী নথিপত্র থেকে সংগ্রহ করা মালমসলা নিজের ছাঁচে ঢালাই করে বইটি লিখেছি। আলোচনী যাতে সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ.-র ইতিহাসের ছাত্রদের পক্ষে একটি

অবশ্য-পাঠ্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক নিয়েই আমার বইটি লেখা। অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠ্যক্রম এতে অনুসরণ করা হয়নি। নূতন পাঠ্যসূচী তৈরির পূর্বেই আমার রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। স্কুল বা কলেজের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্যও আদপে আমার ছিল না। তৎসত্ত্বেও মনে হয় বইটি ইতিহাসের স্নাতক পাঠার্থীদের জ্ঞানানুশীলনে ও পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনে সহায়তা করবে।

স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধক্রমে বইটি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। বড়ই পরিতাপের বিষয়, নানারূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ তাঁর জীবদ্দশাতে লেখা শেষ করে উঠতে পারিনি। উপরন্তু, লেখা সম্পূর্ণ হবার পরেও একাধিক কারণে বইটি ছাপিয়ে বার করতে ততোধিক বিলম্ব ঘটেছে। সময়ে অনুরোধ রক্ষা করতে না পেরে যে অনুশোচনা অন্তরে নিরন্তর অনুভব করছি, কখনও তা ঘুচবার নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিলাষ পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি, তাতে হৃদয়ের গুরুভার কথঞ্চিৎ প্রশমিত বোধ করছি। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা আজ আমার প্রথম কর্তব্য।

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব তাঁর নিজের বই লেখা নিয়ে বিশেষ ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও সময় করে আমার অপরিচ্ছন্ন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি ধৈর্যের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন এবং আমাকে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। সেজন্য তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটি সুচিন্তিত সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়ে পুস্তকটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন এবং আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। উপ-করণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় লাইব্রেরীতে কখনও কখনও পড়তে গিয়ে গ্রন্থাগারিকদ্বয় ও তাঁদের সহকর্মিগণের নিকট যে সৌজন্য ও সাহায্য পেয়েছি, তজ্জন্য তাঁদের সাধুবাদ জ্ঞাপন না করলে কর্তব্যহানি হবে বলে মনে করি। দেশের বর্তমান আপদ্‌কালীন অবস্থায় বই, বিশেষতঃ পাঠ্যপুঁথি ও নাটক-নভেল ব্যতীত অন্য বই, ছাপান খুব সহজ ব্যাপার নয় দেখলাম। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক অগ্রণী হয়ে পুস্তকটি প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করাতে তাঁর কাছে আমি বিশেষ বাধিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুস্তকটির রচনায় ও মুদ্রণে যত্নের ত্রুটি করা হয় নাই। তথাপি অনিচ্ছাকৃত অনবধনতায় দু'একটি ভুলচুক রয়ে গেছে। যেমন ৭৬ ও ৯০ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কমিটি ভুলে রাজ-নীতিক কমিটি বলে উল্লিখিত হয়েছে, যদিও অন্যত্র তার ঠিক সংজ্ঞাই দেওয়া হয়েছে। ৬৫ পৃষ্ঠার ৩য় অনুচ্ছেদের ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে 'হয়ই নি' স্থলে শুদ্ধপাঠ হবে 'হয়েইছে'। যে সব শব্দের বিকল্প বানানের বিধান আছে, পূর্বাপর তাদের একরূপ বানান ব্যবহারই অভিপ্রেত ছিল। সতর্কতা সত্ত্বেও কোথায়ও কোথায়ও নিয়মটির বিচ্যুতি ঘটেছে। মুদ্রাকর প্রমাদও যে একেবারে ঘটেনি এমন নয়। ২৯ পৃষ্ঠায় 'স্টেফানো' 'স্টে্রফানো', ১১২ পৃষ্ঠায় 'প্রত্যক্ষ' 'প্রিত্যক্ষ' ও 'বিষয়ক' 'বষয়ক' এবং ১২২ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে '১১০' '১১১' এরূপ অশুদ্ধ ছাপা হয়েছে। এরূপ সামান্য সামান্য দোষত্রুটি আরও লক্ষিত হতে পারে। আমার বিনীত নিবেদন, সহৃদয় পাঠকগণ যেন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উপেক্ষা করে 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' তেমনিভাবে সন্দর্ভটিকে গ্রহণ করেন। বইটি যদি তাঁদের মোটামুটি ভাল লাগে, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

কলিকাতা
জুন, ১৯৬৩

শ্রীপরিমল রায়

১
পটভূমিকা

আজ যারা স্বাধীন ও 'দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান', এমন কি তাদের মধ্যে যারা 'প্রধান', যেমন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স, অতীতে কোন না কোন সময়ে তাদেরও ললাটে 'দাসত্বের ধূলি' এঁকে দিয়েছিল 'কলঙ্ক-তিলক'। যুদ্ধে হারিয়ে এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করেছে, কখনও তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে, কখনও বা দুইই 'এক দেহে লীন' হয়ে গেছে। আবার কাল ও ঘটনাচক্রের আবর্তনে এমনও ঘটেছে যে উভয় জাতিই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; অথবা যারা ছিল প্রভু তারাই হয়েছে দাস এবং যারা ছিল দাস তারা শুধু দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করে নি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপরের উপর আধিপত্যও বিস্তার করেছে।

ইতিহাসের আদি ও মধ্য-পর্বে আমরা দেখতে পাই যে অধিকতর বলশালী যাযাবর জাতিগুলিই পার্শ্ববর্তী বসতির অপেক্ষাকৃত কিংবা সমধিক উন্নত সভ্য জাতিদের উপরে আধিপত্য স্থাপন করেছে এবং পরিশেষে তাদের অঙ্গীভূত হয়েছে। আঘাত এসেছে কালস্রোতে তরঙ্গের মত একের পর এক এবং পূর্ব ইতিহাস শুধু পুনরাবৃত্ত হয়েই চলেছে। সভ্যতার আদিভূমি মিশর, মেসোপোটামিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতি সুপ্রাচীন দেশ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালের গ্রীক, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের, এবং আরও পরের বাইজেণ্টাইন, পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য ও মুসলিম আরব সাম্রাজ্যগুলির পুরাবৃত্তের মধ্যে এই ঐতিহাসিক ধারা অতি সুস্পষ্ট। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল

জাতির হানাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার উপর যাযাবরদের শেষ আক্রমণ। ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মধ্য-এশিয়ার যাযাবর মোঙ্গল ও তাদের স্বজাতীয়দের প্রাধান্য ভারতে, চীনে, পারস্যে, উত্তর-আফ্রিকায়, ইউরোপের পূর্বাংশে—অর্থাৎ তখনকার দিনের পরিচিত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল এবং ইউরোপের পশ্চিমাংশও তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল।[১] কিন্তু ষোড়শ শতক শেষ হতে না হতেই তাদের গৌরব-সূর্য অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ে।

অতীতের এই দীর্ঘ সাত-আট হাজার বছরের ইতিহাস বিচিত্র হয়ে উঠেছে বিভিন্ন জাতির (tribe, race) উত্থান-পতন, বন্ধন-মুক্তি, ও ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু Nation অর্থে জাতি তখনও জন্মায় নি, দেশাত্মবোধ ঠিক জাগে নি, এবং বর্তমান সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপও ফুটে ওঠে নি। Tribe বা Raceকে কেন্দ্র করেই মানুষ তার সমাজ বেঁধেছে এবং রাজনৈতিক জীবনের পত্তন করেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাত্যভিমান বৃহত্তর মিলনকে দীর্ঘকাল ঠেকিয়ে রেখেছে। মিশর, ব্যাবিলন, এসিরিয়া, ভারত ও চীন প্রভৃতি প্রাচীন প্রাচ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে বিবিধ জাতি (tribe, race) একত্রিত হয়েছে কিন্তু সংহত হয় নাই। সম্রাটের অধীনতা, তাও কখনও নামে মাত্র, স্বীকার করে তারা তাদের পৃথক সত্তা, আচার-অনুষ্ঠান ও অবাধ স্বাধীনতা প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে এবং কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বারবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা সাময়িকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে ; কিন্তু শক্তির বাঁধনে যে জাতিগুলিকে (tribe, race)

১. H. G. Wells তাঁর *The Outline of History* গ্রন্থে লিখেছেন, 'A man of foresight surveying the world in the early sixteenth century might well have concluded that it was only a matter of a few generations before the whole world became Mongolian —and probably Moslem'.-পৃ: ৭২৭

এক সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল, শক্তির ক্ষয়ে তারা সহজেই পৃথক্ হয়ে পড়েছিল।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর বর্বর উপজাতিগুলির আক্রমণে ও লুটতরাজে ইউরোপময় চূড়ান্ত অরাজকতা উপস্থিত হয়েছিল। লোকেরা দলে দলে 'স্থানত্যাগেন' শুধু দুর্জনদের পরিহার করে নাই, উপায়হীন হয়ে তাদের দুর্নীতিও অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রাচীন সভ্যতার শেষরশ্মি নিভে গিয়ে দুর্দিনের অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছিল ; কিন্তু তারি মধ্যে ক্রমশঃ ফুটে উঠেছিল ছোট্ট একটি আলোর রেখা। উপজাতিগুলির (tribe) বৈষম্য ও ব্যবধান ধীরে ধীরে ঘুচে গিয়ে তাদের সংসক্তি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হচ্ছিল। অবশেষে তারা বৃহত্তর জাতিতে (race) পরিণত হয়েছিল। ইউরোপের ইতিহাসে তাই এই কালটিকে "One of origins—of the beginnings of peoples, of languages, and of institutions" বলা হয়েছে।[২]

একাদশ শতক থেকে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরে আসার পর, তখন থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে অবস্থানের ফলে বিভক্ত জাতিগুলির বিভিন্নতা স্বতঃই অভিব্যক্ত হয়ে উঠল। একস্থানে পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের জন্য সেই তল্লাটের বাসিন্দারা স্বভাবতঃই স্বকীয় একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। জাতির (race) এই নব রূপায়ণেই nation-এর সৃষ্টি। উপজাতিগুলির (tribes) জাতিতে (race) পরিণতি এবং জাতির (race) nation-এ রূপান্তর, এই দুটি ঐতিহাসিক ধারা যুগপৎ প্রবাহিত হয়েছিল। পনের-ষোল শতকে ইউরোপে nation-এর রূপ এবং জাতীয়তার (nationality) চেতনা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

২. Myers, *Mediaeval and Modern History*-পৃঃ ২

মধ্যযুগে ইউরোপের বহুধা বিভক্ত ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মের সৌভ্রাত্র-নীতির সূত্রে গ্রথিত করে লুপ্ত রোম সাম্রাজ্যের অনুকরণে একটি বিরাট রাষ্ট্র গঠন করবার কল্পনা ক্ষীণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে। এই সাম্রাজ্যটি ছিল নিতান্তই ঢিলেঢালা ধরনের। সম্রাট নামমাত্রই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনিই সাম্রাজ্যের একেশ্বর, তখনকার দিনে প্রচলিত এই উক্তিটি ছিল শুধু কথার কথা। প্রকৃতপক্ষে সমাজ ছিল তখন সর্বত্রই সামন্ত-প্রথার (Feudal System) বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেজন্য কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা রাজার প্রতি কারও প্রত্যক্ষ আনুগত্য ছিল না। নিজ নিজ গোষ্ঠীপতির শাসনই শুধু লোকেরা মানত এবং তাদের সব কিছু দায়-দায়িত্ব ছিল স্বীয় ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কালে কালে সামন্ত-প্রথাও ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সামন্তদের পরস্পরের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বে উত্যক্ত জনসাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে ও নবলব্ধ জাতীয়তার প্রেরণায় সমগ্র দেশে এক রাজাকেই জাতির প্রতীক ও প্রভুরূপে বরণ করে নিল। অন্যদিকে খ্রীষ্টানদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে এবং তাদের বিরোধ ও বাদানুবাদের ফলে, রোমক সম্রাট ও পোপের প্রতিও লোকেদের আনুগত্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। জাতীয়তার উন্মেষ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন এই কারণেও অনেকটা সহজ হয়েছিল। বলা বাহুল্য পরিবর্তনটি আকস্মিকভাবে এক দিনে ঘটে নাই; ধীরে ধীরে সমাজের প্রায় অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যেই সাধিত হয়েছিল।[৩]

যা হোক্, মধ্যযুগের অবসানকালে পশ্চিম-ইউরোপের প্রায়

---

৩. "......the great political change from tribal division governed by vague aspirations towards unity to a complete severance of the European nations was largely unconscious. Not until the change had occurred was any one really conscious of its direction." *Delisle Burns, Political Ideals*-পৃঃ ১২৫-৬

সর্বত্র বিশেষ বিশেষ জাতি ও তাদের জাতীয় রাষ্ট্র এমনি করে গড়ে উঠতে লাগল। তন্মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী ও স্প্যানিশ এই তিনটি জাতি এবং তাদের রাষ্ট্রই ছিল অগ্রগণ্য। তাদের রাষ্ট্রের গঠন ছিল রাজতন্ত্র (Monarchy)। সুইস জাতির অভ্যুদয় প্রসঙ্গক্রমে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা সামন্ত শাসনের শৃঙ্খল ও পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন করে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র (Republic)। পূর্ব-ইউরোপে সদ্য তাতার-শাসনমুক্ত রুশ দেশে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রুশ রাজতন্ত্র। কিন্তু অন্যত্র অনুরূপ পরিণতি সমধিক বিলম্বিত হয়েছিল; অটুট মোঙ্গল প্রভুত্বে অবস্থান্তর সহজসাধ্য ছিল না। ইউরোপের পশ্চিমাংশেও জার্মান ও ইটালিয়ান জাতির সংহতি ও স্বকীয় রাষ্ট্র স্থাপন তখনও নানা কারণে সম্ভবপর হয় নাই।

ইউরোপে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটেছিল নানাদিকে বিপুল পরিবর্তনের সূচনার মধ্যে, যার জন্যে নূতন যুগটি যথার্থই Renaissance (নবজন্ম) নামে অভিহিত হয়েছে। এই যুগটি যে সকল বিচিত্র চিন্তা ও কর্মধারার প্রবাহে অপূর্ব হয়ে উঠেছিল, তাদের আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে একটি নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল—রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) —এই প্রসঙ্গে আমাদের তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মধ্যযুগের রাজনৈতিক আদর্শ—ইউরোপে তথা সারা বিশ্বে এক ধর্মরাজ্য স্থাপন —তার অবাস্তবতা ও অসম্ভাব্যতা পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছিল[৪] এবং অবশেষে নূতন জাতীয় রাষ্ট্রের অভিব্যক্তিতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। নূতন রাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও আভ্যন্তরিক আধিপত্য এতই সুস্পষ্ট ছিল যে নূতন

---

৪. It was an unrealized ideal because it was too crudely conceived : the unity of civilized humanity cannot mean the submission of every group to one central power.—বার্নসের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৪

সিদ্ধান্তটি রাষ্ট্রের এই সকল লক্ষণের স্বীকৃতি মাত্র। Jean Bodin লিখিত Six Livres de la République গ্রন্থেই (১৫৭৭ খ্রীঃ) আমরা এই মতবাদের প্রথম সুচারু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দেখতে পাই।

সার্বভৌমত্বের দুইটি দিক। একটি রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধের এবং অপরটি রাষ্ট্রের সহিত তার নিজস্ব প্রজার সম্পর্কের। এই দিক দুটি যেন রাষ্ট্রের সদর ও অন্দর। প্রথমটির বিষয়ে প্রতিপাদ্য এই যে, এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র হতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ; এবং ছোটই হোক আর বড়ই হোক, তাদের সবারই সমান অধিকার ও মর্যাদা। জাতির (nation) চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশনই হচ্ছে রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যের মূল প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য। সার্বভৌমত্ব নীতির প্রতিপাদনে এই সত্যটির সম্যক্ উপলব্ধির অভাব ছিল। তাই স্বাতন্ত্র্যের মূল উদ্দেশ্য রইল চাপা পড়ে, তার অভিমানই হয়ে উঠল বড়। আদিমকালে অসভ্য মানুষ যেমন মনে করত অন্যকে না মারলে নিজে বাঁচা দায়, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির মনোভাবও হল তেমনি। নানা উপায়ে শক্তিসাম্য রক্ষা করবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাদের পরস্পরের অবিশ্বাস ও ঈর্ষা কেবলই ঘনীভূত হতে লাগল। যথাসাধ্য শক্তিসঞ্চয়ই হয়ে উঠল প্রত্যেকের প্রধান লক্ষ্য। শক্তির পরীক্ষায় প্রবলেরই জয়। অতএব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অবস্থা-বৈগুণ্যে 'জোর যার মুল্লুক তার' এই আদিম বর্বর নীতিরই জের টেনে চলল।

সার্বভৌমত্বের অন্য দিকটি হচ্ছে এই যে, নিজের পরিধির মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বা বর্গ সবারই উপরে রাষ্ট্রের চরম ও অবিসংবাদিত প্রভুত্ব। সার্বভৌমত্বের এই পারিভাষিক ব্যাখ্যায় অধিরাজ (overlord) ও সামন্ত-প্রথা, ধর্মগুরু পোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন নগরীর অস্তিত্ব প্রভৃতি মধ্যযুগের প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত পড়ল এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হল। রাষ্ট্র ও রাজা অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য, তখনকার দিনে এই স্থূল ধারণাটাই ছিল বলবৎ।

দুয়ের পার্থক্য এবং রাজার সহিত প্রজার বৈধ সম্বন্ধ এই নিয়ে মনন ও আলোচনার সবেমাত্র সূত্রপাত হয়েছিল; কিন্তু চিন্তার জগতে তখনও তার স্পষ্ট রেখাপাত হয় নাই। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব রাজার বা শাসকের একচ্ছত্রাধিপত্য ও তার স্বৈরাচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয়তঃ, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতির মধ্যে এক দেশবাসী সুসম্বদ্ধ জাতিমাত্রেরই রাষ্ট্র গঠনের অধিকার সূচিত হলেও খোলাখুলিভাবে গৃহীত হয় নাই। বরং সার্বভৌম নীতিতে অন্তর্ভূত স্বতন্ত্র জাতি বা উপজাতির উপর রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব ব্যক্ত হওয়ার ফলে পরবর্তী কালে তাদের স্বাতন্ত্র্য-লাভের স্পৃহা সহজেই দমন করবার পথ প্রশস্ত হল।

কালের বিস্তৃত পটে ইতিহাস-বিধাতা জাতি ও রাষ্ট্র মিলিয়ে যে ছবি ফুটিয়ে তুলছিলেন, তাকে তিনি অনেকটা ঝাপসা করেই আঁকছিলেন। এতদিনে তার রূপরেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং স্বাধীন বা পরাধীন জাতি ও দেশের এতদিনকার আবছা মূর্তি জগতের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

২

সাম্রাজ্য-বিস্তার ঃ প্রথম পর্ব

Renaissance শুধু ইউরোপের নয় সমগ্র পৃথিবীর পরবর্তী ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। এই ইতিহাসের একটি বড় প্রস্থচ্ছেদ—পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষোড়শ শতকের গোড়াতে ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং তার পরে আড়াইশ' বছরের মধ্যে পর্তুগাল, স্পেন নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স, ও ইংলণ্ড এই পাঁচটি আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী রাজ্যের সাম্রাজ্যে পরিণতি লাভ। যেরূপে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, তার বৃত্তান্ত নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হল।

সুদূর অতীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যের ঘাঁটি ছিল এক প্রান্তে ইটালির এবং অপর প্রান্তে ভারতের পশ্চিম উপকূলভাগের বন্দরগুলি। দুয়ের মধ্যে বাণিজ্য চলত ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের পথে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ভূমধ্যসাগরে তুর্কীদের প্রভাব ও উৎপাতের দরুন, নূতন বাণিজ্যপথের হদিসে পর্তুগীজ বণিক ভাস্কো-দা-গামা এবং স্পেনের পৃষ্ঠপোষকতায় জেনোয়াবাসী বণিক কলাম্বাস বিপরীতমুখে যাত্রা করে, একজন আফ্রিকা ঘুরে লক্ষ্যস্থল ভারতে এসে পৌঁছলেন (১৪৯৭ খ্রীঃ) এবং অপর জন আবিষ্কার করলেন নূতন মহাদেশ আমেরিকা (১৪৯২ খ্রীঃ)। কিছুকাল পরে জাতিতে পর্তুগীজ কিন্তু স্পেনের বেতনভোগী নাবিক ম্যাগিলান দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে অজানা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সুদূর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হলেন (১৫১৯খ্রীঃ)। অন্য দিকে পর্তুগীজ নাবিকেরা বাত্যা-বিতাড়িত হয়ে ব্রেজিল

আবিষ্কার ও দখল করলেন (১৫০০ খ্রীঃ) এবং অনতিকাল পরে ভারত ও সিংহলের সীমানা পেরিয়ে জাভা ও মালক্কার উপকূলভাগের দেখা পেলেন (১৫১৫ খ্রীঃ)।

প্রথমে সামুদ্রিক অভিযানগুলির উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য ; কিন্তু অচিরেই রাজনৈতিক আধিপত্য ও সুবিধামত উপনিবেশ স্থাপন অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে যাতে সংঘর্ষ না বাধে, সেজন্য পোপ উভয়ের অধিকার ভাগ ও নির্দিষ্ট করে দিলেন[১]। গোটা উত্তর-আমেরিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকারও প্রায় সবটাই, অর্থাৎ আমেরিকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্পেনের ভাগে পড়ল। পর্তুগাল পেল দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল ও পূর্বের সামান্য কিছু অংশ, আর পেল এশিয়া-আফ্রিকার আধিপত্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। ইউরোপের সমৃদ্ধ দেশগুলি, এমন কি পর্তুগাল পর্যন্ত, তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যে একাধিপত্য। কিন্তু শতাব্দী শেষ হতে না হতেই তার পতন সুরু হল।

সপ্তদশ শতকের আদিতেই ওলন্দাজেরা স্পেনীয়দের কবল হতে মুক্তিলাভ করেছিল। স্পেনের অবনতি ও পর্তুগালের অধীনতা এই দুয়ের সুযোগ নিয়ে তারা ক্রমশঃ প্রাচ্যের বাণিজ্যে ও রাজনীতিক অধিকারে পর্তুগীজদের স্থান দখল করে ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের পত্তন করল এবং শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত হল।

অপর প্রান্তে, আমেরিকাতে, স্পেন সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যে লুব্ধ এবং তার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিও পোপের বিচার অমান্য করে[২] ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। উত্তর-আমেরিকায়

---

১. মধ্যযুগে রাষ্ট্রের উপর পোপের আধিপত্য ও প্রভাবের একটি নিদর্শন।

২. মধ্যযুগের অবসানে রাষ্ট্রের উপর পোপের ক্ষমতা-হ্রাসেরএকটি বড় প্রমাণ।

স্পেন সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে ১৮৫৪ খ্রীঃ থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল ইংরেজদের উপনিবেশ। তাদের উদ্যম গোড়াতে ততটা সফল হয় নি ; কিন্তু ১৬২০ খ্রীঃ থেকে খ্রীষ্টধর্মের সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদে উৎপীড়িত নরনারী দলে দলে দেশত্যাগ করে আমেরিকায় এসে নূতন নূতন বসতি স্থাপন করতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশাধিকার উত্তর আমেরিকার সমগ্র পূর্ব-উপকূলভাগে বিস্তৃত হল। ঠিক পশ্চিমে প্রায় সমান্তরাল অংশ উত্তরে ক্যানাডা অবধি ফরাসীরা দখল করে নিল। কাড়াকাড়িতে ওলন্দাজ দিনেমার প্রভৃতি অন্য যারা যোগ দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তারা তেমন বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে নি।

সাম্রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে। বাণিজ্য, উপনিবেশ ইত্যাদি তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বরং স্বৈরাচারী রাজা-রাজড়াদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, দুরভিসন্ধি, ক্ষমতা-প্রিয়তাই নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহের এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের মুখ্য প্রেরণা জুগিয়েছিল। যুদ্ধ ইউরোপের সীমা ছাড়িয়ে আমেরিকায়, ভারতে, জলপথে, সকল বিরোধের ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সপ্তবার্ষিক যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) উপসংহারে ভারতে ও আমেরিকায় ফরাসী শক্তি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হল। ওলন্দাজেরা পূর্বেই ইংরেজদের কাছে পরাভূত হয়েছিল। ক্যানাডা এখন ফরাসীদের হাত থেকে ইংরেজদের অধিকারে এল এবং ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হল। জয়ের গৌরবে তাদের সাম্রাজ্য-পিপাসা উদগ্র হয়ে উঠল এবং অচিরেই তাদের নাবিকেরা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি নূতন ভূখণ্ডের সন্ধান পেয়ে সেখানে তাদের ভাবী সাম্রাজ্যের বীজ বপন করল।

বিপুলায়তন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি জাতীয় রাষ্ট্রেরই বিকৃত অভিব্যক্তি এবং তৎকালীন সংকীর্ণ সার্বভৌম নীতি—যা এনেছিল বাইরে অরাজকতা ও ভিতরে স্বৈরতন্ত্র—তারই অন্যতম কুফল।

ঘটনাপ্রবাহের এই পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী অন্তঃসলিল স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছিল। একাধিক মনীষী এবং রাষ্ট্রনেতার চিন্তা ও কাজের ধারার মধ্যে মানবতান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যাচ্ছিল। এই বিশ্ব-মানবিকতাবোধ আঠার শতকে কালের গতির পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল[৩]।

আঠার শতকের শেষে ফরাসী বিদ্রোহের আন্দোলনের মধ্যে উদীয়মান জাতীয়তা (nationalism) নূতন শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করল। ফরাসী বিপ্লববাদে অবশ্য জাতীয়তার উপর কোন জোর ছিল না বরং জাতিবর্ণনির্বিশেষে মানুষের অধিকারের কথাই সেখানে জোর গলায় বলা হয়েছে। এই অধিকারের দাবিতে গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল, তাতে রাজভক্তির মূল শিথিল হয়ে দেশের টানই সর্বসাধারণের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রবল হয়ে দাঁড়াল। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম সকলের সমবেত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল[৪]।

উদ্বোধিত জাতীয় চেতনার ফলে সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ধরল। দূরত্বের জন্য আমেরিকার উপনিবেশগুলির সঙ্গে মাতৃভূমির যোগসূত্র

---

৩. The temper of the time and the larger sympathy of man with man, which especially marks the eighteenth century as a turning point in the history of the human race, was everywhere bringing to the front a new order of statesmen,…………, whose characteristics were a love of mankind, and a belief that as the happiness of the individual can only be secured by the general happiness of the community to which he belongs, so the welfare of individual nations can only be secured by the general welfare of the world.—J. R. Green, *A Short History of the English People*-পৃঃ ৭৯১

৪. The Renaissance, however, divided Europe rather into a collection of states than into nations. The ideal of the time was governmental independence, not group-development. And it was not until the Revolution had come and gone that the long slumbering national consciousness came to birth as a new ideal—Burnsএর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৩

ছিল নিতান্তই ক্ষীণ ও শ্লথ। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র বিশিষ্ট জাতিরূপে (nation)। স্বার্থের সংঘাতে দুয়ের অনিবার্য বিরোধে জাতীয়তার নূতন আদর্শ ই জয়লাভ করল। প্রথমে স্বাধীনতা অর্জন করল ইংলণ্ডের অধীন উপনিবেশগুলি। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হল ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং সমর্থন লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একে একে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্পেন ও পর্তুগালের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করল। ভাগ্য-বিপর্যয়ে আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় পাঁচ পাঁচটি সাম্রাজ্যই অতিশয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ব্রিটিশ ব্যতীত অন্য সাম্রাজ্যগুলি ক্ষয়ক্ষতির পর যৎসামান্যতেই এসে ঠেকেছিল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নেপোলিয়ন ইউরোপে যে বিপুল সাম্রাজ্য সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তার কারণ শুধু তার সামরিক প্রতিভা নয়। স্বৈরতন্ত্রের কঠিন বন্ধন হতে মুক্তিদানের জিগির তুলে, নবমন্ত্রে দীক্ষিত ফরাসীজাতিকে তিনি সহজেই তাতিয়ে ও মাতিয়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই অন্য জাতির বিরুদ্ধে তার অভিযান এত দ্রুত সফলতা লাভ করেছিল। পরে যখন তিনি লোভ ও অহঙ্কারের মত্ততায় জাতীয়তার দাবিকে অকাতরে ও নির্বিচারে পদদলিত করতে সুরু করলেন, তখনই তার বিজয়রথ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পরিণামে চূর্ণবিচূর্ণ হল।

নেপোলিয়নের পতনের পর (১৮১৫ খ্রীঃ) যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক শান্তি-বৈঠকে (ভিয়েনার কংগ্রেস) রাষ্ট্রগুলি যেভাবে পুনর্গঠিত হল, তাতে জাতীয়তাবাদের কোন মর্যাদাই দেওয়া হল না। রাজা-রাজড়াদের স্বার্থে ও অন্যবিধ কূটনৈতিক প্রয়োজনে খেয়াল-খুশিমত কৃত্রিম সীমানা টেনে ইউরোপকে ভাগ করা হল। যে ক্ষুদ্র জাতিগুলি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে অসমসাহসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের স্বাধীনতা-প্রীতি ও দুঃখবরণ হল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ফিনল্যাণ্ড ও বেসারাবিয়াকে রাশিয়ার, বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের, এবং রাইন নদীর পারের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হল। জাতীয় সংহতি ভণ্ডুল করে দেবার উদ্দেশ্যে ইটালিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধীনে বিভক্ত করা হল এবং জার্মান দেশে অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে ৩৯টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের এক শিথিল সমাবেশ (Confederation) গড়া হল। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অপর অংশেও শ্লাভ, ম্যাগায়ার প্রভৃতি হরেক জাতি অন্তর্ভুক্ত রইল। রাশিয়া, প্রাশিয়া, ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে খণ্ডিত হয়ে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব পূর্বেই লুপ্ত হয়েছিল (১৭৯৫ খ্রীঃ) ; নূতন বিলি-ব্যবস্থায় মূলতঃ তার কোন পরিবর্তন হল না।

৩
সাম্রাজ্য-বিস্তার : দ্বিতীয় পর্ব
স্বাধীনতা-সংগ্রাম

ভিয়েনার কংগ্রেসে যে ঠুনকো কাঠামো খাড়া করা হয়েছিল, শীগ্‌গির তা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তার অন্যতম প্রধান কারণ স্বাধীনতা-লাভের জন্য ব্যাপক জাতীয় বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। Renaissance-যুগে যে জাতীয়তার উন্মেষ হয়, ক্রমেই তা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ফরাসী বিপ্লবের উদারনৈতিক ভাবধারা তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাতে প্রবল বেগের সঞ্চার করেছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম যথাক্রমে তুরস্ক ও নরওয়ের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করল। এই সময়ে (১৮২৯ খ্রীঃ) রুমানিয়াও তুরস্কের শাসনমুক্ত হয়ে কার্যতঃ স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পেরেছিল। পোলেদের এবং ইটালিয়ানদের বিদ্রোহ হল ব্যর্থ।

জাতীয়তাবাদ জাতিমাত্রেরই স্বতঃস্ফূর্তির সহজাধিকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং স্বাতন্ত্র্য (independence), ঐক্য (unity), এবং স্বাধীনতার (liberty) আদর্শ তার অপরিহার্য অঙ্গ। একটির সহিত অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কার্যক্ষেত্রে এই তিনটির বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল-মোচন, অব্যবহিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতিবিশেষের সংহতিসাধন, ও স্বৈরতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র স্থাপন যথাক্রমে এই ত্রিবিধ চেষ্টার ভিতর। মুক্তিসংগ্রামে আদর্শ তিনটির উপর সকল ক্ষেত্রে সমান জোর দেওয়া হয় নাই এবং অবস্থা-ব্যতিক্রমে সমানভাবে কার্যকরীও হয় নাই। কিন্তু ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে জনবিদ্রোহ ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর যখন আবার ইউরোপের চারদিকে জাতীয়

অভ্যুত্থান সুরু হল, তখন জাতীয়তার ভাব ও আদর্শ অনেকটা উপরোক্ত নির্দিষ্ট কার্যক্রম অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছিল।

১৮৬১ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে ইটালির রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য পূর্ণতা লাভ করেছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়াকে পরাভূত করে প্রাশিয়া জার্মান জাতির নেতৃত্বে নিজেকে অভিষিক্ত করল। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে তার জয়লাভের পর, অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রগুলি তাকে অগ্রণী করে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হল। ফলে জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল। সাম্রাজ্যের মধ্যে জার্মান জাতি তার দীর্ঘ বিলম্বিত ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য পেল বটে কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নয়। এদিকে প্রাশিয়ার কাছে ঘা খেয়ে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের শুভবুদ্ধির উদয় হল। ফলে হাঙ্গারি নির্বিবাদে পেয়ে গেল আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু হাঙ্গারিতে রুমানিয়ান, যুগোশ্লাভ, শ্লোভাক, চেক, পোল, ইটালিয়ান ইত্যাদি যে সকল ভিন্ন জাতির বাস ছিল—যাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল পার্শ্ববর্তী স্বজাতীয়দের সহিত মিলনে জাতীয় ঐক্য স্থাপন—তাদের পরতন্ত্রতার গ্লানি ও দুঃখ ঘুচল না।

তুরস্কের বশ্যতায় যেসব ইউরোপীয় জাতি ছিল, তাদের মুক্তি-সংগ্রাম প্রথম পর্যায়ে শুধু গ্রীসের, ও সার্ভিয়ার আংশিক স্বাধীনতা লাভে পরিসমাপ্ত হয়েছিল। ১৮৭৬-৭৭ সালে রাশিয়ার সক্রিয় সহায়তায় সংগ্রাম সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করল। স্যান স্টেফানোর সন্ধিতে পরাজিত তুরস্কের সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হল। ইউরোপের মানচিত্রে তুরস্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু সত্বরই সন্ধির শর্ত পরিবর্তিত হল, রাশিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ভীত ও ঈর্ষান্বিত ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপের ফলে। নূতন সন্ধিতে (বার্লিন সন্ধি, ১৮৭৮ খ্রীঃ) কতকগুলি স্বাধীন ও কতকগুলি অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হল। রুমানিয়া, সার্ভিয়া, ও মণ্টেনিগ্রো স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি পেল। আর বুলগেরিয়া হল ত্রিধা-বিভক্ত। তার এক ভাগ ফিরিয়ে দেওয়া

হল তুরস্কের হাতে ও বাকী দুই ভাগকে দেওয়া হল স্বায়ত্তশাসন তুরস্কের করদ রাজ্যরূপে। এই ফাঁকে ইংলণ্ডের লাভ হল সাইপ্রাস দ্বীপ। সন্ধির চক্রান্তে অস্ট্রিয়ারও যোগসাজশ ছিল। সুতরাং তার লভ্যাংশে পড়ল বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনার শাসনাধিকার। নামে অবশ্য তারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশই থেকে গেল। পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে যখন গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল তখন সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে অস্ট্রিয়া প্রদেশ দুটিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিল।

অক্লান্ত সংগ্রামের পরও লক্ষ্যসিদ্ধি ইউরোপের পূর্বাংশে অপূর্ণ ই রয়ে গেল। পশ্চিমভাগে আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তি-প্রয়াস নিষ্ফল হয়েও ক্ষান্ত হল না। আয়র্ল্যাণ্ডে ইংলণ্ডের আধিপত্য দ্বাদশ শতাব্দীতে সুরু হলেও, ষোড়শের শেষে ও সপ্তদশের প্রারম্ভেই তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে সেখানে ব্রিটিশ ভূ-বাসনের সূত্রপাত হল। তারপর থেকে ক্রমাগত নির্যাতন ও শোষণের ফলে এই হতভাগ্য দেশটি দুর্দশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল; কিন্তু শত চেষ্টাতেও কিছুতেই তার জাতীয়তার-বিলোপ সাধন সম্ভব হল না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে "তরুণ আয়র্ল্যাণ্ড" সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বসল, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে "ফেনিয়ান বিপ্লবের" সূচনা হল এবং স্বাধীনতার আন্দোলন পূরাদমে চলতে লাগল।

উনিশ শতকে একদিকে চলেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং অন্য দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের তোড়জোড়। এই পরস্পর-বিরোধী কার্যপরম্পরার কারণ ছিল সুস্পষ্ট। আমরা দেখেছি যে, উদ্ভিন্ন জাতীয়তা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব-নীতিকে অবলম্বন করে জাতি-বিদ্বেষ ও বিরোধই সৃষ্টি করেছিল। আমরা এও দেখেছি যে, ফরাসী বিপ্লববাদ প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হয়েও জাতীয়-তাকেই পরিপুষ্ট করেছিল। কারণ উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও, তত্ত্বটিতে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সঙ্গতি স্থাপন ও রক্ষার কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত আদৌ ছিল না। কাজেই যে জাতীয়তার

মন্ত্র ক্ষুদ্র জাতিকে তার স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রেরণা দিয়েছিল, প্রবল জাতির মধ্যে তাই দূষিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল।[১]

রাশিয়ার তদানীন্তন সম্রাট আদর্শবাদী ও ভাবপ্রবণ প্রথম আলেকজাণ্ডার ইউরোপের প্রায় সকল রাজাকেই নিজেদের মধ্যে শান্তিরক্ষার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) রচনা করেছিলেন। তাঁর আদর্শ গ্রহণ করবার সময় তখনও আসে নি। আর কারও এই মৈত্রীতে আন্তরিকতা বা আস্থা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সঙ্কল্পটিকে কার্যকরী করবারও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং সম্রাটের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় অবসিত হল। বরঞ্চ সম্মিলিত পরামর্শ ও কাজের মারফত বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বর্তমান শক্তি-সাম্য (Balance of Power) ও চলতি ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্যে অষ্ট্রিয়ার চতুর প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের উদ্যমে যে একটি রাষ্ট্রজোট (Concert of Europe) গঠিত হয়েছিল, তার প্রভাবে ও তৎপরতায় শান্তি অন্ততঃ দৃশ্যতঃ বজায় ছিল। কেননা তাতে একদিকে বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে তখনকার মত বিবাদে ক্ষান্ত রাখা ও অন্যদিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ পরাধীন জাতিগুলিকে দাবিয়ে রাখা উভয় কাজই সহজ হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থের সংঘাতে রাষ্ট্রজোট বেশী দিন টিকে নাই। পক্ষান্তরে আলেকজাণ্ডারের ভাব ও কাজের ধারা জাতীয় স্বার্থ-প্রণোদিত কূটনীতির মরুবালুরাশিতে একেবারে শুষ্ক ও বিলীন হয়ে যায় নি ; রুদ্ধস্রোত অন্তঃসলিল প্রবাহে কালের প্রান্তর অতিক্রম করে এসে জাতি ও রাষ্ট্রসঙ্ঘে পরিণত হয়ে সুদূর ভবিষ্যতে চরিতার্থতা লাভ করেছে।

---

১. "...what is Nationalism in a small group becomes Imperialism when the group is powerful." Burns-এর উল্লিখিত পুস্তক, পৃঃ ১৯২।

২

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তার পরিণতি ঘটল। দেশের উৎপাদন-শক্তি তাতে বহুগুণ বেড়েছিল। ফলে প্রচুর কাঁচামাল ক্রয়ের এবং উদ্বৃত্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের প্রয়োজন যুগপৎ উপস্থিত হয়। নিজ নিজ উপনিবেশ ও অধিকারের মধ্যে বাণিজ্যবিস্তার যত সহজ অন্যত্র তত নয়। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পোন্নতি এনে দিল দেশের ঋদ্ধি। ঋদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পেল জনসংখ্যা। বাড়তি লোকের খাদ্য ও স্থানের অকুলানে দরকার হল বিদেশে শস্য-সংগ্রহ ও উপনিবেশ-পত্তন। সব দিক থেকেই সাম্রাজ্যের আবশ্যকতা অনুভূত হতে লাগল। বাষ্প ও পরে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারে দেশবিদেশে যাতায়াত ও সর্বত্র সংযোগরক্ষার পথও যথেষ্ট সুগম হল।

নূতন পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডই প্রথম রাষ্ট্রজোট থেকে খসে পড়ল। সামুদ্রিক আধিপত্য যোড়শ শতকে ছিল পর্তুগাল ও স্পেনের এবং পরবর্তী শতকে ওলন্দাজদের; শেষোক্ত শতকের মধ্যভাগ থেকে তা ক্রমশঃ ইংরেজদের আয়ত্তাধীন হল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নেপোলিয়নের শেষ পরাজয়ের পর জলপথে ব্রিটিশ প্রাধান্য অবিসংবাদিতরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। জলপথে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করে ইংলণ্ড নয়া সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সহজেই সফলতা লাভ করেছিল। অনতিবিলম্বে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইউরোপের অন্যান্য আরও দেশ। সাম্রাজ্যলোলুপ "জাতীয় স্বার্থদানবের" করাল গ্রাসে পতিত হল একে একে বহু জাতি ও দেশ।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশের প্রাচ্য সাম্রাজ্য ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে, সিংহলে, দক্ষিণ ব্রহ্মে (কিছুকাল পরে উত্তর ব্রহ্মেও), সিঙ্গাপুর ও মালয়তে ব্যাপ্ত হল। বস্তুতঃ এই সময়কার যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপই ডাচদের থেকে ব্রিটিশদের হাতে এসেছিল; কিন্তু শেষকালে সন্ধির রফায় (১৮০২ খ্রীঃ)

সেখানে ডাচ প্রভুত্বই কায়েম রইল। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ফ্রান্সের সাম্রাজ্য সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু দক্ষিণ চীনের বাণিজ্য হস্তগত করার উপলক্ষে দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে ফ্রান্স ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইন্দোচীনে তার নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করল। উনিশ শতকের আরম্ভে এশিয়াতে রাশিয়ার সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সমাধির উপর তার ক্ষমতা-সৌধ নির্মাণের চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে রাশিয়া আবার এশিয়াতেই অগ্রসর হয়ে একদিকে ককেসাস অঞ্চলের অনেকটা আত্মসাৎ করে তুরস্ক ও পারস্যের সীমানায় এবং অপরদিকে মধ্যভাগের উপজাতিগুলিকে কুক্ষিগত করে আফগানিস্থান অবধি তার প্রভুত্ব প্রসারিত করল।

একই সময়ে চীনেও সুরু হয়েছিল সাম্রাজ্য-লোভীদের তাণ্ডব-লীলা। সর্বনেশে আফিমের নেশা বন্ধ করতে গিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চীন যুদ্ধে নামল এবং পরাস্ত হয়ে হংকং ছেড়ে দিতে এবং পাঁচটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা দিতে বাধ্য হল (১৮৪২ খ্রীঃ)। বাণিজ্যের নামে অচিরেই অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিও এসে জুটল এবং তাদের জবরদস্তিতে চীনকে আরও বন্দরে খুলে দিতে হল বহির্বাণিজ্যের অবারিত দ্বার। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে জাপান পেল ভয়। তার আশঙ্কা হল যে অচিরেই হয়ত তারা চীনের করদ রাজ্য কোরিয়া পর্যন্ত ধাওয়া করে আসবে, তখন তার নিজের নিরাপত্তাই হবে সংশয়-সঙ্কুল। এই নিয়ে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাধল চীন-জাপানের যুদ্ধ। কোরিয়া তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল কিন্তু জয়ী জাপান চীনের কাছ থেকে আরও যেসব জায়গা কেড়ে নিয়েছিল, রাশিয়া, ফ্রান্স, ও জার্মানির সমবেত বাধা পেয়ে ফরমোসা ব্যতীত আর কিছুই তার অধিকারভুক্ত করতে পারল না।

চীনের প্রতীচ্য বন্ধুদের প্রকৃত অভিপ্রায় বেশী দিন অপ্রকাশ রইল না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সামান্য একটা অজুহাতে রাশিয়া, জার্মানি,

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধামত স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে স্ব স্ব প্রভুত্বের এলাকা নির্দিষ্ট করতে ব্যস্ত হল। সমগ্র চীনকে গ্রাস করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করবার মতলব তাদের সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু হিস্যা নিয়ে বোঝা-পড়ার অভাবে অভিসন্ধি বাস্তবে পরিণত হল না। পরিণামে চীন উনিশ শতকে একটি অর্ধ-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে অধোগত হল।[২]

সাম্রাজ্য-লিপ্সার নগ্ন ও কদর্য রূপ বিশেষ করে ফুটে উঠল আফ্রিকা মহাদেশে। উনিশ শতকে আফ্রিকার উত্তর অংশে ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্য। দুর্বল তুরস্কের কাছ থেকে ফ্রান্স আলজিরিয়া (১৮৩০ খ্রীঃ) এবং টিউনিসিয়া (১৮৮১ খ্রীঃ) ছিনিয়ে নিল। টিউনিসিয়ার উপরে ইটালির লোভ ছিল। আশায় বঞ্চিত হয়ে ইটালি লোহিত-সাগরের তীরে ইরিট্রিয়া উপনিবেশ গঠন করে তার নূতন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করল। পার্শ্ববর্তী আবিসিনিয়া অধিকারের চেষ্টায় কিন্তু তার যুদ্ধে পরাজয় ঘটল (১৮৯৬ খ্রীঃ)। ঋণ পরিশোধ করতে না পারার অপরাধে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের শাসনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়ের যুগ্ম কর্তৃত্ব এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডের একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণে সুদানেও তার অধিকার প্রসারিত হল। এইভাবে আফ্রিকার উত্তর বেলাঞ্চলে ইউরোপীয় জাতিগুলি একে একে জেঁকে বসল।

---

২. Thus, China in the nineteenth century became a semi-colonial area open to intrusions from her land and sea borders, and was subjected to the "unequal treaties". These limited her tariff autonomy, made her customs revenue security for foreign loans, imposed a one-way open door, and gave foreign states jurisdiction over their own subjects in Chinese territory, with the right to establish extraterritorial zones in Chinese ports. China had temporarily lost her full sovereignty......... "—Duncan Hall, *Mandates, Dependencies And Trusteeship*-পৃঃ ১০

ডিয়াস, ভাস্কো-দা-গামা প্রভৃতি নাবিকদের আবিষ্কারের সময় থেকে পর্তুগীজরা উপকূলভাগে স্থানে স্থানে ঘাঁটি ও কেল্লা তৈরি করে এবং আশেপাশে এখানে ওখানে ছোট ছোট বসতি স্থাপন করে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। অভ্যন্তরে একমাত্র ডাচদেরই দক্ষিণ-আফ্রিকাতে একটি উপনিবেশ ছিল। তারও সীমা আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের তীর থেকে ১৫০ মাইলের বেশি ছাড়িয়ে যায় নি। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত আফ্রিকার অন্তর্দেশ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ক্রমে পর্যটক ও মিশনারীরা, যাদের মধ্যে লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মহাদেশটির সম্বন্ধে নানাবিধ ভৌগোলিক ও অন্যান্য তথ্য আহরণ করতে লাগলেন। বেলজিয়ামের রাজার আহ্বানে রাষ্ট্রনীতিবিদ্, ব্যবসায়ী, মিশনারী ও বৈজ্ঞানিকরা ব্রাসেল্সে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আফ্রিকার উন্নয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক আফ্রিকা-সংসদ গঠন করলেন। কিন্তু স্ট্যানলির রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী প্রকাশে ইউরোপে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে সুরু হল ভৌমিক অধিকার বিস্তারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পুরাতনদের সাথে এসে ভিড়ল নূতন সাম্রাজ্য-লোলুপের দল। তাদের মধ্যে নববলে বলীয়ান জার্মানিই ছিল অগ্রগণ্য। আসন্ন বিরোধ নিবারণের চেষ্টায় বার্লিনে একটি সম্মেলন আহূত হল (১৮৮৪ খ্রীঃ)। তাতে আপোষে যে মীমাংসা হয়েছিল বেলজিয়ামের রাজার সঙ্গে বোঝাপড়ার অভাবে মুহূর্তেই তা ভেস্তে গেল। আবার কাড়াকাড়ি সুরু হল। অবশেষে পরস্পরের সন্ধি ও রফা-নিষ্পত্তি ক্রমে গোটা মহাদেশটাই তারা উনিশ শতকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে নিল। তিনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন দেশ মাত্র তাদের 'বর্বর লোভ' থেকে রেহাই পেল—মুক্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের বাস্তভূমি লাইবিরিয়া, মুসলমান রাজ্য মরক্কো এবং প্রাচীন আবিসিনিয়া।

যেরূপে মহাদেশটি বিভক্ত হল সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি। দক্ষিণ-সীমায় ডাচদের উপনিবেশ (কেপ কলোনি) ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দেই ব্রিটিশের দখলে এসেছিল। সেখান থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে ইংরেজরা প্রায় গোটা দক্ষিণ অঞ্চলটাই তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল। উপরন্তু পশ্চিম উপকূলে নাইজিরিয়া ও গোল্ড কোস্ট এবং পূর্বে কেনিয়া, ইউগাণ্ডা প্রভৃতিও তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। ফরাসীরা তাদের সাম্রাজ্য ফেঁদে বসেছিল আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া হতে সুরু করে সাহারা সমেত উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভাগের প্রায় সারাটা দেশ জুড়ে। অধিকন্তু মাদাগাস্কার দ্বীপও তাদের অধীনে ছিল। মধ্য-আফ্রিকায় কঙ্গোতে বেলজিয়াম রাজার রাজত্ব বহাল ছিল। নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়েছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় এবং পূর্বে ট্যাঙ্গানিকায়। পর্তুগাল এই হিড়িকে তার এলাকা বাড়িয়ে নিয়েছিল পুবে মোজাম্বিক ও পশ্চিমে এঙ্গোলা এই দেশ ছুটি দখল করে। স্পেনের বরাতে মিলেছিল যৎসামান্য—সাহারা ও মরক্কোর অতি ক্ষুদ্র অংশ ও উত্তরে ট্যাঞ্জিয়ার। উত্তরে লোহিত সাগরের তীরে ইটালির পূর্বোল্লিখিত সাম্রাজ্য অটুট রয়ে গেল।

যেমনি এশিয়ায় ও আফ্রিকায়, তেমনি অস্ট্রেলেশিয়াতেও ইউরোপীয় জাতিদের, বিশেষ করে ইংরেজদের, সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্বর্ণখনি আবিষ্কারের পর অস্ট্রেলিয়াতে ব্রিটিশ উপনিবেশন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন রাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিল না। শতাব্দীর শেষপাদে যখন প্রশান্ত মহাসাগরে বিদেশী শক্তির আবির্ভাব হল, তখন থেকেই দেশ-প্রতিরক্ষার উদ্বেগে তাদের মিলন-গ্রন্থি নানা বাধা-বিপর্যয়ের মধ্যেও দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগল। পরিশেষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৬টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মিলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত অথচ স্বাধীন অস্ট্রেলিয়ার সমামেলটি (Confederation)

গঠিত হল। আদিম অধিবাসী দুর্ধর্ষ মাওরীদের প্রবল বিরোধিতার জন্যে নিউজিল্যাণ্ডে ইংরেজদের অধিকার বিস্তার তেমন সুসাধ্য হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীঃ থেকে সেখানে ব্রিটিশদের উপনিবেশ গঠন সুরু হয়েছিল; কিন্তু শেষ দশকের আগে পর্যন্ত দেশটি রাজনৈতিক স্থৈর্য লাভ করতে পারে নাই। তার পরে অনতিকাল মধ্যেই নিউজিল্যাণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অপর একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ সমস্তই বখরা করে নিয়ে নিজ নিজ প্রভুত্বের এলাকা ঠিক করে নিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও দুইটি নূতন অংশীদার—যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান।

এমনি করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপের পরাক্রান্ত রাষ্ট্রগুলি প্রায় সারাটা দুনিয়াই দখল করে বসল। কেবলমাত্র আমেরিকা মহাদেশে ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা আর এগুতে পারে নি। মনরো নীতি[৩] তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেখানে ইউরোপের স্থানে অধিষ্ঠিত হল যুক্তরাষ্ট্র তার নবজাত সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে। জয় বা ক্রয়লব্ধ নূতন নূতন দেশের সংযোগে আদি যুক্তরাষ্ট্র বিশাল হতে বিশালতর হয়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগে আটলান্টিক হতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এক বিরাট অবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে স্ফীত হল। একমাত্র আলাস্কাই ছিল এই রাষ্ট্রের বিযুক্ত অংশ। শতাব্দীর শেষে তার আধিপত্য বিস্তৃত হল মেক্সিকো উপসাগরে

৩. ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ভয় পেয়ে গেল যে আমেরিকাতে যেসব দেশ ইদানীং স্পেনের বেহাত হয়েছিল, সেগুলো আবার দখল করবার জন্যে তারা হয়ত চেষ্টা করতে পারে। ভীত হয়ে রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো অবিলম্বে ঘোষণা করলেন (১৮২৩ খ্রীঃ) যে স্বাধীন আমেরিকা মহাদেশের কোথাও আর ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন সঙ্গত হবে না এবং কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ উদ্যমকে যুক্তরাষ্ট্র তার শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বলে মনে করবে। এই ঘোষণা অনুসারেই যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং নীতিটি ইতিহাসে 'মনরো নীতি' নামে আখ্যাত হয়েছে।

ক্যারিবিয়ান সাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বিক্ষিপ্ত দ্বীপগুলিতে। বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জাতিসমূহের মধ্যে ব্যাপ্ত হল তার সুদূর-প্রসারী সাম্রাজ্য। পৃথিবীতে আর প্রায় এমন কোন জাতি বাকী রইল না যা শ্বেতজাতির পদানত না হল।

সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে এল "ভদ্রবেশী বর্বরতা" "জাতিপ্রেম নাম ধরি"। যে অঞ্চলের অবস্থান ও জলবায়ু শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের উপযোগী, যেমন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান, সেখানে আদিম অধিবাসীদের প্রায় নির্মূল করে অগ্রসর হল উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তার। অনুরূপ পরিবেশে আফ্রিকাতে একই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর রীতিতে বিভিন্ন ইউরোপীয় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে দেশী লোকদের সমূলে উৎখাত করা সম্ভবপর হয় নি। বরং প্রতি রাষ্ট্রেই ছিল তারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। অবশ্য বলা বাহুল্য, প্রভুত্ব ও প্রাধান্য ছিল মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের। সর্বত্র—শুধু অসভ্য বা অর্ধসভ্য জনবিরল দেশে নয়, প্রাচীন সভ্য কিন্তু প্রগতিহীন জনাকীর্ণ দেশগুলিতেও—মহৎ দায়িত্ব বহনের ধুয়া (White man's burden) ধরে শাসনের সঙ্গে চলেছিল নিদারুণ শোষণ।[৪] যুক্তরাষ্ট্রের পরদেশ-শাসননীতি

৪. They (i.e. Europeans) believed that there was some innate intellectual drive in the west, and some innate indolence and conservatism in the east, that assured the Europeans a world predominance for ever.

The consequence of this infatuation was that the various European foreign offices set themselves not merely to scramble with the British for the savage and undeveloped regions of the world's surface, but also to carve up the populous and civilized countries of Asia as though these peoples, also, were no more than raw material for European exploitation.—H. G. Wells-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০১৪।

এত অনুদার ও স্বার্থান্ধ ছিল না। কোথায়ও যেমন কিউবা, পোর্টোরিকো ইত্যাদি স্থানে তার প্রভুত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্ণ সমর্থন ও সম্মতিক্রমেই। কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বাধা পেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নগ্ন মূর্তি উদ্ঘাটিত করতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করে নাই। তথাপি ইউরোপের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য-নীতি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

সাম্রাজ্য-দানবের জর্জর বন্ধন ও পীড়ন হতে শ্বেতজাতিও অব্যাহতি পায় নাই। তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পেয়েছি উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামের শোণিতপাতে। আমেরিকা হারিয়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা হয় নাই। ক্যানাডাতে তারা তাদের বাঁধন আরও শক্ত করে আঁটতে লাগল। অগৌণে সেখানে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হল এবং ফরাসী ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের পরস্পরের দ্বন্দ্বে সমস্যা অধিকতর গুরুতর হয়ে উঠল! সমস্যার নিরাকরণে উপদেশ দানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ডারহাম কমিশনের নিয়োগ হল এবং তাঁদের সুচিন্তিত রিপোর্টের পর ঔপনিবেশিকতার মোড় ফিরল। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানাডার উপনিবেশগুলি স্বায়ত্তশাসন পেল এবং অল্পকাল মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক নয়া যুক্তরাষ্ট্র পত্তন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভে পরিগণিত হল। কালক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ-বহুল বা শ্বেতাঙ্গ-প্রধান উপনিবেশগুলি, যথা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (১৮৫৫ খ্রীঃ), অস্ট্রেলিয়া (১৯০০ খ্রীঃ), নিউজিল্যাণ্ড (১৮৫২ খ্রীঃ), দক্ষিণ-আফ্রিকা (১৯০৯ খ্রীঃ) ক্যানাডার মতই এক একটি সমপর্যায়ভুক্ত স্বাধীন অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রে পরিণত হল। অবশ্য দক্ষিণ-আফ্রিকাতে এই পরিণতি বিনা দ্বন্দ্বে সংঘটিত হয় নাই। ডাচ ঔপনিবেশিকদের সহিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের

বিরোধের ফলে বুয়ার যুদ্ধ (১৮৯৯—১৯০২ খ্রীঃ) বেধে গিয়েছিল ; কিন্তু পরাজিত বুয়ারদের উপনিবেশগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেও স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত করা হল না। সাম্রাজ্যবাদের নব রূপায়ণে ইতিহাসে যথার্থই একটি অর্থপূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা হয়েছিল।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন এসেছিল শাসনযন্ত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রভাবেই, যার লক্ষণ আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে ক্রমবর্ধমান শ্বেত উপনিবেশগুলি যথাসময়ে নির্বিবাদে সমান ও পূর্ণ অধিকার লাভ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রদেশ (territory) হতে রাষ্ট্রের (State) পঙ্‌ক্তিতে উন্নীত হয়েছিল। চারদিকে সাম্রাজ্যবাদের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে ক্যানাডাতে সাম্রাজ্যনীতির নবসূচনা ও যুক্তরাষ্ট্রে তার আপেক্ষিক উদার প্রকাশ একটি ক্ষুদ্র প্রদীপের মত জ্বলে উঠেছিল, যার ক্ষীণ রশ্মি দিয়েছিল চিহ্নহীন পথের সন্ধান।

৪

সাম্রাজ্যবিস্তার ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনুবৃত্তি ঃ আন্তর্জাতিক সংগঠনের উপক্রমণিকা

সাম্রাজ্য-'বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়' প্রখর উনবিংশ 'শতাব্দীর সূর্য' 'অস্ত গেল রক্তমেঘ মাঝে'। স্বার্থের সংঘাতে ও লোভের জিগীষায় যুদ্ধের আগুন জ্বলে না উঠলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ধূমায়িত বহ্নি-শিখা। বিংশ শতাব্দী বিগত শতাব্দীর জের টেনেই এগিয়ে চলল। ইংলণ্ডের পরে ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশেও ক্রমশঃ শিল্পের বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠল যখন উনিশ শতকের শেষে ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য-নীতি (Free Trade) পরিহার করে নিজের সাম্রাজ্যের মধ্যে পরস্পরের বাণিজ্যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের নীতি (Imperial Preference) গ্রহণ করল। ফ্রান্সের ও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত দেশগুলিতে প্রথমাবধিই ভিন-দেশের বেসাতি শুল্ক ও পরিবহণের বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সুতরাং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে বোধ হতে লাগল। কিন্তু "স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ ক্ষুধানল তত তার বেড়ে ওঠে।" সুতরাং যারা বঞ্চিত শুধু তারা নয়, যারা লব্ধকাম তারাও ক্ষমতা ও অধিকার বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরস্ত হল না।

বিংশ শতকের সুরুতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা চীনে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি নিয়ে রুশ-জাপানে যুদ্ধ (১৯০৪ খ্রীঃ)। ক্ষুদ্র জাপান বৃহৎ রাশিয়াকে হারিয়ে কেবল অসাধ্য সাধন

করে নাই, প্রতীচ্যের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের উপর প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হেনে ত্রস্ত দুর্বল প্রাচ্য জাতিদের অনেকের মনে সাহস ও আত্ম-প্রত্যয় জাগিয়ে তুলল। রাশিয়ার কাছ থেকে পোর্ট আর্থার, দক্ষিণ শাখালিন প্রভৃতি জায়গা ছিনিয়ে নিয়ে, কোরিয়াতে প্রথমে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং পরে দখল করে নিয়ে (১৯১০ খ্রীঃ), জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হল।

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও রুশ সাম্রাজ্য পরস্পরের বৈরিতা ত্যাগ করে একটা বোঝাপড়া করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করল। আফগানিস্থান, দক্ষিণ-পূর্ব পারস্য ব্রিটিশদের, পক্ষান্তরে উত্তর পারস্য রুশদের এখতিয়ারের এলাকা বলে উভয়ে মেনে নিল। পারস্যের মধ্যবর্তী অংশ নামে মাত্র স্বাধীন রইল।

১৯০৪ হতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কূটনীতি, ছলচাতুরী ও জোর-জুলুম প্রভৃতি নানা উপায়ে ফ্রান্স ক্রমশঃ ক্রমশঃ মরক্কো অধিকার করে নিল। এই দুর্বল পতনোন্মুখ রাষ্ট্রটি গ্রাস করতে তার এত সময় লাগত না, যদি জার্মানি তাতে বাদ না সাধত। সাম্রাজ্যের অংশ-বিশেষ (ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড) ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সকে জার্মানির সঙ্গে রফা করতে হল। ইটালিও সুযোগ বুঝে সামান্য একটা অজুহাতে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে তার দখল থেকে ট্রিপলি ও সাইরেনেইকা (বর্তমানে লিবিয়ার অংশ) কেড়ে নিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তাতে সায় ছিল। আফ্রিকা-ব্যবচ্ছেদের সামান্য যা বাকী ছিল তা এবারে সম্পূর্ণ হল। ফ্রান্স পেল ৪২½ লক্ষ, ইংলণ্ড ৩৫ লক্ষ, জার্মানি, ইটালি, বেলজিয়াম ও পর্তুগাল প্রত্যেকে সামান্য কমবেশী ১০ লক্ষ বর্গমাইল। স্পেনেরও যৎকিঞ্চিৎ লভ্য হয়েছিল। শুধু দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র অবশিষ্ট রইল, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) ও যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয়পুষ্ট লাইবিরিয়া।

বিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আধিপত্য আমেরিকা মহাদেশে আরও বিস্তৃত হয়েছিল। আধিপত্যের বিস্তার

হয়েছিল মামুলি ধরনেই অর্থাৎ ছলে-বলে-কৌশলে। বিশৃঙ্খলা নিবারণ ও শান্তিরক্ষার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র কখনও সামরিক কখনও বা রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন করে পানামা খাল, ল্যাটিন আমেরিকা, ও ক্যারিবিয়া এসব অঞ্চলের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে আপন প্রাধান্য স্থাপন করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অক্টোপাস-বন্ধনে তাদের এমন সাপটে ধরেছিল যে, সত্য কথা বলতে তারা আশ্রিত রাষ্ট্রেই অবনমিত হয়েছিল।

যেমন উনিশ শতকে তেমনি বিশ শতকেও সাম্রাজ্য প্রসারের সঙ্গে যুগপৎ চলেছিল জাতীয় ও গণ-অভ্যুত্থান। নিষ্পেষণে প্রশমিত হলেও বিদ্রোহ দমিত ত হয়ই নি বরং আরও ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে গণবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ামাত্র সুযোগ বুঝে বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং ক্রীট স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন গ্রীসের সহিত মিলিত ও সংযুক্ত হল। তখনও বলকান রাষ্ট্রগুলির সংলগ্ন প্রদেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ গ্রীক, বুলগেরিয়ান ও সার্ভিয়ান তুরস্কের বশ্যতায় ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে একযোগে তুরস্ককে আক্রমণ করে তার সমগ্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বলকান রাষ্ট্রগুলি জয় করে নিল। জটিল বলকান-সমস্যার তাতে সমাধান হল না। যুদ্ধের শেষে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গোলমাল বাধল। গোলযোগের মূলে ছিল প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-প্রণোদিত অভিসন্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ বলকান জাতিদের আত্মকলহ।

যুদ্ধপূর্ব শর্তে বলকান রাষ্ট্রগুলি বৃহত্তর সার্ভিয়া গঠনে প্রতিশ্রুত ছিল। প্রতিশ্রুতি পালনে তাদের কোন আপত্তিও ছিল না। কিন্তু তাল পাকাল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে স্যান স্টেফানো সন্ধি পণ্ড করবার সময়ে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারিই ছিল ব্রিটেনের দোসর। মধ্য-এশিয়া নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে যাওয়ার ফলে বলকানে আর ব্রিটেনের কোন স্বার্থ ছিল না। এবারে তাই নিজ নিজ মতলব হাসিল করবার জন্যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারির

সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ব্রিটেন নয় অপর দুইটি স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্য-গৃধ্নু দেশ, জার্মানি ও ইটালি। তাদের চাপে পড়ে সার্ভিয়া বাধ্য হয়ে আগেকার শর্ত ছেড়ে নূতনভাবে বলকানকে ভাগ করবার প্রস্তাব উত্থাপন করল। তাতে বুলগেরিয়ার সহিত মতান্তর ঘটার ফলে নিজেদের মধ্যেই আবার লড়াই বেধে গেল। হাঙ্গামার সুযোগে তুরস্ক তার হৃত সাম্রাজ্যের খানিকটা পুনরুদ্ধার করে নিল। যুদ্ধাবসানে যে সন্ধি হল (১৯১৩ খ্রীঃ), তাতে সার্ভিয়া আয়তনে প্রায় দ্বিগুণত হল, গ্রীসও ম্যাসিডোনিয়ার অংশ, থ্রেস ইত্যাদি পেয়ে যথেষ্ট লাভবান হল। শুধু পরাজিত বুলগেরিয়ার রাষ্ট্র-পরিধি প্রায় পূর্ববৎ রয়ে গেল। জাতির হৃদয়ে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ছাইচাপা আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে হাঙ্গারিতে ৭০ লক্ষের মত যুগোশ্লাভ, হাঙ্গারি ও রাশিয়াতে ৮০ লক্ষ রুমানিয়ান, এবং অষ্ট্রিয়াতে বহুসংখ্যক চেক, পোল প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকের বসবাস ছিল। পূর্বেই বলেছি তারা সবাই পার্শ্ববর্তী স্বজাতীয়দের সহিত সঙ্গম লাভের জন্য উন্মুখ ছিল। এই সব অপরিপূরিত বলকান-সমস্যার স্ফুলিঙ্গ থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

পশ্চিম প্রান্তে অবিরাম বিপ্লব ও আন্দোলনের ঠেলায় অতিষ্ঠ ব্রিটিশ সরকার ১৯১৪ সালে আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন (Home Rule) দিয়ে একটি আইন পাস করতে বাধ্য হল। কিন্তু আলস্টারের বিরোধিতায় এবং পরে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আইনটি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

বিশ শতকের গোড়ায় ভারতে ও মিশরে এবং তুরস্কের অধীন আরব দেশগুলিতেও মুক্তি-আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধির আশা তখনও তাদের সুদূরপরাহত। চীনের দুর্দশা ও লাঞ্ছনা 'যথা পূর্বং তথা পরম্' চলছিল। বিদেশীদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ (বক্সার বিদ্রোহ, ১৯০০ খ্রীঃ) রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা ও

জাপান এই ছয়টি শক্তির সমবেত চেষ্টায় সহজেই দমিত হয়েছিল ফলে বিদেশীরা আরও সুবিধা করে জেঁকে বসল। দেশময় গভীর নৈরাশ্যের ছায়া পড়ল। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাতির প্রাণে আবার নূতন করে সাড়া জাগল। নূতন আশা ও উদ্দীপনার তরঙ্গে অবশেষে প্রাচীন সাম্রাজ্য ভেসে গেল (১৯১১ খ্রীঃ)। বিপ্লবী দেশপ্রেমিকেরা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন; কিন্তু তাঁদের পরস্পরের দ্বন্দ্বে দেশটি দ্বিধা-বিভক্ত হল এবং স্বদেশের গলায় বিদেশীদের ফাঁস যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল।

স্পষ্টই দেখা গেল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর' পথে প্রায় অপ্রতিহত গতিতেই অগ্রসর হয়ে চলেছিল। নূতন সাম্রাজ্য-নীতি প্রাচীন সাম্রাজ্য-নীতির মত মানব-জাতির বিভিন্ন শাখাকে তার মৌলিক একতার সূত্রে গেঁথে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ বা পরিকল্পনা নিয়ে জন্মায় নি। পরন্তু "জাতীয় স্বার্থ-দানবের পায়ে" ক্রমাগত "নরবলির উদ্যোগে" তার নগ্ন কদর্যতা বীভৎস হতে আরও বীভৎস হয়ে প্রকাশ পেল।[১] ঈর্ষা-বিদ্বেষ-জর্জরিত সাম্রাজ্যলোভী অসুরেরা "নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্যে......বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্রমাগতই তলোয়ারে শাণ দিচ্ছিল"। কেবল মাত্র কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রকে আশ্রয় করে কোন গতিকে তারা সংঘর্ষ ও যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে পেরেছিল।

দুঃখের বিষয়, এই উগ্র মত ও পথ দার্শনিক মহলে কারও কারও সমর্থন পেয়েছিল। কূট তর্কের জাল বিস্তার করে তাঁরা এই স্বার্থান্ধ নির্মম নীতিকে একটি যুক্তিসম্মত সারবান তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে

১. This modern imperialism is not a synthetic world-uniting movement like the older imperialism; it is essentially a megalomaniac nationalism, a nationalism made aggressive by prosperity. H. G. Wells-এর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ১০৬২ পৃঃ।

সক্ষম হয়েছিলেন। নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রশস্তি রচনা করবার ও গাইবার জন্যে কবি এবং চারণেরও অভাব হয় নি। দার্শনিক, কবি, ও চারণ প্রভৃতির ঘৃতাহুতিতে সাম্রাজ্যবাদের হোমানল সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সব দূরদ্রষ্টা মনীষী এই 'অপদেবতার মন্দিরের' 'প্রাচীর' 'চূর্ণ করে ধূলোয় লুটিয়ে' দেবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁদের বাণী মর্মর-প্রস্তরের উপর বারিপাতের ন্যায় পাশ্চাত্য-মানবের চিত্তক্ষেত্রে তখনও কোন দাগ কাটতে পারে নাই। পরিণামে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছিল। "মহা-অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া—জগতের মহা চিতানল।" ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার বৎসর সমুদয় পৃথিবী জুড়ে চলেছিল এক বিরাট কুরুক্ষেত্র।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনের যে চৌদ্দ দফা প্রস্তাবে যুদ্ধের বিরতি হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য তিনটি প্রতিশ্রুতি। প্রথম, অনেক অধীন জাতিকে স্বাধীনতা ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার দান; দ্বিতীয়, পরস্পর-বিরোধী ঔপনিবেশিক দাবি দাওয়ার নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত আপস-নিষ্পত্তি; তৃতীয়, জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠা। নিম্নে যথাস্থলে আমরা এই ঘোষণা তিনটির আরো বিস্তারিত আলোচনা করছি।

এক জাতীয় লোক এক রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে বাস করবে, জাতীয়তাবাদের এইটেই মূল প্রতিপাদ্য ও লক্ষ্য। মনে পড়বে যে ভিয়েনার সন্ধিতে (১৮১৫ খ্রীঃ) নীতিটিকে একেবারেই কোন আমল দেওয়া হয় নাই। পরেও কার্যক্ষেত্রে আদর্শটির অভিব্যক্তি নানাবিধ ঘটনাচক্রে কখনও বিকৃত, কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কার্যতঃ যাই হোক না কেন, Renaissance-এর সময় থেকে এই চিন্তা ও ভাবধারা নানাভাবে পরিপুষ্টই হয়ে এসেছে। উইলসন তাঁর ঘোষণাতে এই নীতিটির উপরে খুবই জোর দিয়েছিলেন। ১৯১৯-২০

খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে[২] ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যেরূপে পুনর্গঠিত হয়েছিল, তাতে উক্ত নীতি যথাসাধ্য অনুসরণ করা হয়েছিল। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি দৃষ্টান্তে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলবে; যথা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারির খণ্ডনে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারি ও চেকোশ্লোভাকিয়া, এই তিনটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তন; ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়েনিয়া ইত্যাদি বল্টিক দেশগুলির রাশিয়ার দাসত্ব-বন্ধন হতে মুক্তি ও পূর্ণ স্বরাজলাভ; ত্রিধা-বিভক্ত পোল্যাণ্ডের ঐক্য ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি; রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি, জার্মানি ও তুরস্কসাম্রাজ্যের যেসব অংশে প্রধানতঃ বিজাতির বাস ছিল সে সমস্ত স্থানকে তদ্দেশীয় রাষ্ট্রের সহিত সংযোজনা।[৩] এই নীতির প্রভাবেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ড থেকে উত্তরাংশ বিচ্ছিন্ন করে বাদবাকিকে আয়র্ল্যাণ্ড ফ্রি স্টেট (বর্তমানে আয়ার) নাম দিয়ে ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হল।

---

২. বিজিত শত্রুদের সহিত বিভিন্ন তারিখে যথা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন জার্মানির, ১০ই সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়ার, ২৭শে নভেম্বর বুলগেরিয়ার এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুন হাঙ্গারির ও ২০শে আগস্ট তুরস্কের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই পাঁচটি সন্ধির মিলিত আখ্যা ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের শান্তি-চুক্তি।

৩. উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যেতে পারে জার্মান সাম্রাজ্যের এলসেস-লোরেন, শ্লেসউইগের উত্তরাংশ, ও মেমেল যথাক্রমে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ও লিথুয়েনিয়াকে অর্পণ; রুমানিয়ার সহিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি সাম্রাজ্যের ট্র্যানসিলভ্যানিয়া ও পূর্ব হাঙ্গারির কতক অংশ এবং রুশ-সাম্রাজ্যের বেসারাবিয়ার সংযোগসাধন; ইটালিতে ট্রিয়েস্টের অন্তর্ভুক্তি; থ্রেস তুরস্কের কাছ থেকে গ্রীসের অধিকারে হস্তান্তর; সার্ভিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারির শ্লাভজাতি অধ্যুষিত দক্ষিণাংশ নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্র রচনা ইত্যাদি।

উপরোক্ত নীতিটি কিন্তু ইউরোপে সর্বক্ষেত্রে এবং সমভাবে প্রযুক্ত হল না। জার্মানি থেকে ডানজিগকে স্বতন্ত্র করে, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে চির-বিচ্ছেদের বিধান দিয়ে, রুমানিয়াতে বহু ম্যাগায়ার এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে অনেক জার্মানকে রেখে স্পষ্টতঃই এই নীতির ব্যতিক্রম করা হয়েছিল। বস্তুতঃ পূর্ব ইউরোপে নবগঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও অনেক ভিন্নজাতীয় লোকের বাস ছিল। এইসব সংখ্যালঘু ভিন্নজাতীয় লোকদের স্বার্থরক্ষাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে যে কলহের উদ্ভব হয়েছিল, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

ইউরোপে যা-ও বা হল, তার সীমার বাইরে নীতিটিকে একরকম বর্জনই করা হল। তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যে সকল নূতন আরব দেশের পত্তন করা হল, যেমন সিরিয়া, লেবানন, হেজাজ (পরবর্তী নাম সৌদি আরব), প্যালেস্টাইন (পরে দুইটি দেশে বিভক্ত), মেসোপোটামিয়া (পরবর্তী নাম ইরাক), ইত্যাদি স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করেও স্বাধীনতার গৌরব অর্জন করতে পারল না। প্রথমোক্ত দুটি দেশকে ফ্রান্সের এবং অন্যগুলিকে ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন করা হল। মিশরের উপর তুরস্কের নামিক প্রভুত্ব লুপ্ত হল কিন্তু ব্রিটিশ দাসত্বের রজ্জু-বন্ধন তার ঘুচল না। ভারত ও চীনের বেলায় এই নীতি একেবারেই মানা হল না; বরং তার চূড়ান্ত ব্যভিচারের নিদর্শন প্রকট হল যখন ভারতের মুক্তি-প্রয়াসকে নিষ্পেষণ করবার জন্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর উপর গুলিবর্ষণ করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হল, এবং জার্মানদের হস্তচ্যুত চীনের শানতুংগ প্রদেশ জাপানের হস্তে সমর্পণ করা হল। তাই স্বতঃই মনে হয় যে, যেখানে জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল, সেখানে বিজিত শত্রুর শাস্তিবিধানই ছিল মূল উদ্দেশ্য, নীতিরক্ষা নয়। নতুবা যেখানেই বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের কারও না কারও স্বার্থ জড়িত ছিল সেখানেই নীতিটি ক্ষুণ্ণ কিংবা অগ্রাহ্য হয়েছিল কেন?

যাহোক্, উইলসনের খাতিরে যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিকতার

বিস্তার অন্ততঃ আর সম্ভবপর হয় নাই। পরাজিত প্রতিপক্ষের বশ্যতা থেকে যে দেশগুলি বিজয়ী রাষ্ট্রদের কবলে এসেছিল, সেখানে তারাই পরিচালকরূপে অধিষ্ঠিত রইল বটে কিন্তু জাতি-সঙ্ঘের আমলানামাতে ন্যাসপাল রূপে (Mandatory)। আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ছিল এই শাসন-ব্যবস্থার (Mandate system) একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই অভিনব শাসনরীতি যে সব দেশে প্রবর্তিত হল, তাদের মধ্যে যথেষ্ট স্তরভেদ ছিল। তাদের এক প্রান্তে ছিল সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্য দেশ—স্বরাজ লাভের সম্ভাবনা ছিল যাদের আসন্ন—এবং অপর প্রান্তে নিতান্তই অনুন্নত, প্রায় প্রস্তরযুগের দেশ স্যামোয়া, নিউ-গিনি প্রভৃতি—যাদের সুদূর ভবিষ্যতেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা ছিল অনিশ্চিত। প্রথমোক্ত দেশগুলি ব্যতীত অন্যত্র মামুলী ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী ছিলেন রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে অনেকেই; কিন্তু উইলসনের নির্বন্ধাতিশয্যে তা হতে পারে নি। তাদের পরস্পরের অসূয়াও তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় ছিল এবং উইলসনের লক্ষ্য পূরণের সহায়তা করেছিল।

ঔপনিবেশিকদের খাস দখলের মধ্যে নব্য শাসনবিধি বা নীতি প্রয়োগ করবার, অন্য ভাগ্য নিয়ামকদের ত কথাই নেই উইলসনের পর্যন্ত, কোন আগ্রহ বা অভিপ্রায় দেখা গেল না। জাতিসঙ্ঘের অঙ্গীকারপত্রের (covenant) ২৩(খ) উপধারা অনুসারে সদস্যগণ এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল যে তারা তাদের অধীনস্থ দেশের প্রজাদের উপর সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ কি হবে এবং কি ভাবেই তা সংরক্ষিত হবে, কোথায়ও তা সূচিত হয় নি। কারও কারও মতে উপধারাটি ছিল ২২শ ধারারই প্রতিরূপ মাত্র; সুতরাং এক রকম নীতি ও পদ্ধতি রক্ষণাধীন দেশের (Mandates) মত অন্যান্য পরাধীন দেশেও (Dependencies) প্রযুজ্য। এই মত

গৃহীত হওয়া দূরে থাক্, উপধারাটি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিসঙ্ঘে প্রায় অর্থহীনের মতই প্রতিপন্ন হল। তবুও রক্ষণাধীন দেশ শাসননীতির পরোক্ষ প্রভাবে ঔপনিবেশিকতার মূল যে একেবারেই শিথিল হয় নাই, এমন কথাও জোর করে বলা চলে না।

আমরা দেখতে পেলাম যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপসংহারে পরাধীন জাতির মুক্তিসমস্যার সমাধান ইউরোপেও পূরোপূরি হল না; বরং কোথায়ও কোথায়ও সমস্যাটি নূতন আকারে দেখা দিল। ইউরোপের বাইরে সমস্যাটি সম্পূর্ণ অমীমাংসিতই রয়ে গেল। সমস্যাগুলির আশু নিরসনের কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। ২২(খ) উপধারাটিতে যে আশার বীজ বপন করা হয়েছিল, তা-ও অঙ্কুরিত হতে পারল না। তবুও 'তা হয়নি মিছে', এ সত্যটি আমরা পরবর্তী আলোচনায় বুঝতে পারব। বস্তুতঃ ম্যাণ্ডেট-নীতির মধ্যে সমস্যা নিরসনের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। আপাততঃ যদিও তার পরিসর ছিল সঙ্কীর্ণ, তার ভবিষ্য-সম্ভাবনা ছিল বৃহৎ।

পুরাতন পরিচ্ছেদটির পূর্ণ সমাপ্তি, তারপর নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা, ইতিহাসে এমন কখনও ঘটে না। নূতন ও পুরাতন দুই-ই পাশাপাশি চলতে থাকে, ক্রমশঃ নূতন পুরাতনকে ছাপিয়ে ওঠে, তারপর এক সময়ে পুরাতনের পালা ফুরিয়ে যায়, রঙ্গমঞ্চে নূতনেরই অভিনয় চলে। জাতির মুক্তি-সংগ্রামও তেমনি ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা টেনে দিচ্ছিল, এইটে আমরা অতীত ইতিহাসের অনুধাবনে প্রত্যক্ষ করলাম।

৫

রক্ষণাধীন দেশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানির অধিকারে যে যে উপনিবেশ ছিল তাদের সবকটার এবং নিকট প্রাচ্যে তুরস্কের অধীন দেশগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যুদ্ধাবসানে জাতিসঙ্ঘের প্রতিভূরূপে বিজয়ী রাষ্ট্রদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, এ কথা পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। রক্ষণাধীন দেশগুলির নাম, তাদের আয়তন, এবং তাদের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলিরও নাম নীচের তালিকায় দেওয়া হল। সবে মিলে দেশগুলির বিস্তার ছিল ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং লোকসংখ্যা ছিল দুই কোটির মতন।

ক্রমিক নম্বর	রক্ষণাধীন দেশ (Mandate)	আয়তন (বর্গ কিমি.)	ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র (Mandatory)
১।	ট্যাঙ্গানিকা	৯৩২,৩৬৪	গ্রেট ব্রিটেন
২।	ক্যামেরুন	৮৮,২৬৬	গ্রেট ব্রিটেন
৩।	টোগোল্যাণ্ড	৩৩,৭৭২	গ্রেট ব্রিটেন
৪।	প্যালেস্টাইন	২৭,০০৯	গ্রেট ব্রিটেন
৫।	ট্রান্স-জর্ডান	৮৮,৯৬০	গ্রেট ব্রিটেন
৬।	ইরাক	২৯৭,০০০	গ্রেট ব্রিটেন
৭।	ক্যামেরুন	৪২৯,৭৫০	ফ্রান্স
৮।	টোগোল্যাণ্ড	৫২,০০০	ফ্রান্স
৯।	সিরিয়া ও লেবানন	১৭০,৭০৬ (১৬২,০০০+৮,৭০৬)	ফ্রান্স
১০।	রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	৫৩,২০০	বেলজিয়াম
১১।	দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	৮২২,৯০৯	দক্ষিণ আফ্রিকা
১২।	নিউগিনি	২৪০,৮৬৪	অস্ট্রেলিয়া
১৩।	পশ্চিম স্যামোয়া	২,৯৩৪	নিউজিল্যাণ্ড
১৪।	নারু	২৯·২৯	ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পক্ষে অস্ট্রেলিয়া
১৫।	ক্যারলিন, মেরিয়ানা ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	২,১৪৯	জাপান

রক্ষণাধীন দেশের শাসন ও পরিচালনা বিধি জাতিসঙ্ঘের অঙ্গীকারপত্রের ২২শ ধারায় নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

(১) যুদ্ধজয়ের ফলে শত্রুরাষ্ট্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশগুলির মধ্যে যাদের অধিবাসীরা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম, তাদের হিতসাধন ও উন্নয়ন সভ্যজগতের পবিত্র দায়িত্ব।

(২) উদ্দেশ্যটি কার্যকরী করবার সবচেয়ে প্রশস্ত উপায় হচ্ছে অগ্রসর জাতিদের মধ্যে যারা এই দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক এবং যাদের সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা বা ভৌগোলিক অবস্থানও তদুপযোগী, জাতি-সঙ্ঘের প্রতিভূরূপে তাদের হাতেই কর্তব্যভারটি অর্পণ করা।

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা এক ছাঁচের না হয়ে, দেশগুলির স্থিতিস্থান, আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা এবং অধিবাসীদের সভ্যতা ও প্রগতির মাত্রা প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

(৪) তুরস্কের অধিকারচ্যুত জাতিগুলি এত উন্নত ও অগ্রসর যে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা একরকম স্বীকার করে নেওয়াই চলে। তবুও আপাততঃ অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না তারা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয় ততদিন তাদের পক্ষে তাদের মনোমত কোন অভিভাবকের সাহায্য ও সুপরামর্শের প্রয়োজন আছে।

(৫) অন্যান্য দাসত্ব-মুক্ত জাতিগুলি, বিশেষতঃ মধ্যআফ্রিকার অধিবাসিগণ, এখনও এমন নিম্নস্তরে রয়েছে যে তাদের শাসন-সংরক্ষণের জন্য অভিভাবক নিয়োগ অপরিহার্য।

অভিভাবকদের কর্তব্য সম্পাদনের রীতি হবে—প্রথমতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন না করে এবং নৈতিক ভিত্তি শিথিল না করে জনসাধারণের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা বজায় রাখা; দ্বিতীয়তঃ দাস, অস্ত্র ও মদের ব্যবসায় সর্বত্র রদ করা; তৃতীয়তঃ কোথাও দুর্গ নির্মাণ বা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন না করা; চতুর্থতঃ দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লোকেদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করা;

এবং পরিশেষে জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্যকেই ব্যবসাবাণিজ্যে সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া।

(৬) গোটাকয়েক এমন দেশও শত্রুশক্তির কবলমুক্ত হয়েছে, যথা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একাধিক দ্বীপপুঞ্জ, যেগুলিকে তাদের স্বস্ব অভিভাবক-দেশের অন্তর্ভুক্ত করে তারই আইনকানুন অনুযায়ী পরিচালনা করাই প্রশাসনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কেননা দেশগুলি হয় জনবিরল নয়ত স্বল্পপরিসর, কখনও সভ্যতার কেন্দ্র হতে দূরে কখনও বা অভিভাবক-দেশটির সন্নিকটে অবস্থিত। শাসন-ব্যবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রেই পূর্বের অণুচ্ছেদে বর্ণিত শাসন-নীতিই অবশ্য পালনীয়।

(৭) প্রত্যেক ন্যাসরক্ষককেই নিজ নিজ রক্ষণাধীন দেশ সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের সংসদের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৮) কোন দেশে কি পরিমাণ কর্তৃত্ব এবং শাসন ও দমনের অধিকার ন্যাসরক্ষকদের হাতে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করে দেবে সঙ্ঘের পরিষদ।

(৯) পূর্বোল্লিখিত বার্ষিক রিপোর্টগুলি গ্রহণ করা ও পরীক্ষা করে দেখা এবং রক্ষণাধীন দেশ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে পরিষদকে উপদেশ দেওয়া, এই উভয় উদ্দেশ্যেই একটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করা হবে।

ধারাটিতে শুধু মূলনীতিই সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন দেশ, কার অভিভাবকত্বে, এবং কি শর্তে রক্ষণাধীন করা হবে তা ঠিক করা এবং তা নিয়ে দফাওয়ারি চুক্তি সম্পাদন করার ভার ছিল মিত্রশক্তির উপর। প্রতিটি দেশের জন্য স্বতন্ত্র চুক্তিনামা নিষ্পন্ন হয়েছিল। তাদের শর্তগুলি হুবহু একরকমের না হলেও সর্ববিষয়ে মূল ধারারই অনুবর্তী। মোটামুটি ক, খ ও গ এই তিন শ্রেণীতে তারা বিভক্ত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ইতরবিশেষ যা ছিল,

তার আলোচনা বাহুল্যবোধে বাদ দেওয়া হল। স্বাক্ষরিত চুক্তিনামাগুলি ছিল জাতিসঙ্ঘের সমর্থনসাপেক্ষ।

উইলসনের প্রথম চৌদ্দ দফা প্রস্তাবে অধীন দেশ শাসনের এই নয়া বন্দোবস্তের কোন নকশা ছিল না। অল্পকাল পরেই তাঁর একটি উক্তিতে আমরা এইটের প্রথম হদিস পাই। আর তাঁরই আগ্রহে ও নেতৃত্বে ব্যবস্থাটি প্যারিসের শান্তিবৈঠকে অনুমোদন লাভ করে। তথাপি একে শুধু তাঁরই উদ্ভাবনা ও কীর্তি, এমন মনে করলে মস্ত ভুল করা হবে। যুদ্ধ শেষ হবার আগে থেকেই ইংলণ্ডে সরকারী নথিপত্রের মন্তব্যের মধ্যে এবং সর্বত্র বে-সরকারী আলোচনায় ভাবটি গর্ভকোষে ভ্রূণের মত ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছিল। বস্তুতঃ এর বীজ ছিল আরও সুদূর অতীতে নিহিত।

পরদেশ-শাসন ব্যক্তিগত বা জাতীয় ব্যবসাদারী ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, পরন্তু প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলবিধানের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনেরই একটি সুযোগ—ষোড়শ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমসাময়িক স্পেনদেশীয় রাজনীতিবিদ্‌দের কারও কারও লেখায় এই মতের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। আঠার শতকের মাঝামাঝি ব্রিটেনে কোন কোন সরকারী ইস্তাহারে ও পার্লামেন্টের বিতর্কে এই আদর্শ নীতিগতভাবে সমর্থন লাভ করে এবং বার্ক প্রভৃতি মানবদরদীদের অক্লান্ত প্রচারে ও গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন-পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটাতে আরম্ভ করে। ক্রমে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দানই তাদের শাসনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্যানাডা ও অন্যান্য শ্বেত উপনিবেশগুলির নির্ঝঞ্ঝাটে স্বাধীনতা পাওয়ার মধ্যে আমরা এর সাক্ষ্য পাই। এশিয়া, এমন কি আফ্রিকার অশ্বেত জাতিসমূহের সম্বন্ধেও আদর্শটির প্রযুজ্যতা উনিশ শতকেই স্বীকৃত হয়েছিল; কিন্তু কার্যতঃ অনুসৃত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেত উপনিবেশগুলির সমীকরণের প্রয়াসের মধ্যে উন্নত আদর্শই ব্যঞ্জিত হয়েছিল এবং

অন্য জাতিদের শাসনেও নিছক সঙ্কীর্ণ সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে পূর্বোক্ত আদর্শবাদেরও প্রভাব ছিল। কিন্তু ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের তখনও এবং আরও অনেক দিন পর্যন্ত চৈতন্যোদয় হয় নাই।

গণতান্ত্রিক ও মানবতান্ত্রিক ভাববাদের ধারাই পরিপুষ্ট হয়ে পরম্পরাক্রমে রক্ষণাধীন দেশের পরিকল্পনায় ও গঠনে পর্যবসিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অপরদিকে এ-কথাও অস্বীকার্য যে পরিণতিটি যদি কেবল ভাববাদ প্রণোদিত ও প্রসূত হত তাহলে নিশ্চয়ই নির্বিশেষে সকল অধীন দেশেই তার প্রয়োগ হত। এই ধরনের ব্যাপক প্রস্তাব যে কোথায়ও কোথায়ও একেবারে না হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু প্যারিসের শান্তিবৈঠকে তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ আদর্শবাদের প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আর একটি অধিকতর প্রবল কিন্তু নিতান্তই অসদৃশ প্রবাহ যার মূল উৎস ছিল কূটনীতির গহ্বরে লুক্কায়িত। অধিকার বা প্রভাব বিস্তার নিয়ে জাতিতে জাতিতে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হলে, প্রভুত্ব বা স্বার্থের এলাকা (spheres of interest) নির্দেশ, আশ্রিত রাজ্য (Protectorate) গঠন, যুগ্ম-শাসন প্রবর্তন ইত্যাদি নানা ফিকিরে সামঞ্জস্যবিধান ও মীমাংসার চেষ্টা উনিশ শতকের ইতিহাসে বিরল নয়। এই বিবিধ কৌশলগুলিই যেন ধাপে ধাপে উঠে পরবর্তীকালে রক্ষণাধীন-রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ মৈত্রী, জোট, আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে অধীন দেশের রাজনীতিক ও অন্যবিধ সমস্যা সমাধানের সমষ্টিগত উদ্যম এই নূতন শাসনপ্রণালীর পথই প্রস্তুত করে আসছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে আফ্রিকা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে ম্যাণ্ডেট-নীতির পূর্বাভাস স্পষ্টই লক্ষিত হয়। প্যারিসে শান্তিসভার অধিবেশনে লয়েড জর্জ যথার্থই বলেছিলেন, 'There was no large difference between the manda-

tory principle and the principle laid down by the Berlin Conference".

বার্লিন ও প্যারিসের সিদ্ধান্ত মূলতঃ এক হলেও, উভয়ের যে পার্থক্যটুকু ছিল তার গুরুত্ব কম নয়। ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রলোভন থেকে শাসককে রক্ষা করবার দুটি কবচ ম্যাণ্ডেটে ছিল—একটি বিশ্বের দরবারে জবাবদিহির দায়িত্ব আর একটি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান। বার্লিন সিদ্ধান্তে এরূপ কোন রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা ছিল না বলেই তার নির্দেশ কখনও যথাযথভাবে পালিত হয় নাই। তখনকার পরিস্থিতিতে এতাদৃশ ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় আদৌ ছিল না। কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশই তার নিজের এখতিয়ারের মধ্যে অপরের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ব বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। যে দেশগুলি শত্রুশক্তিদের শাসনে ছিল এবং যুদ্ধের সময়ে তাদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, শান্তিস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। তাদের বেলাতেই নব্যনীতির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ জাতিসঙ্ঘ বা অনুরূপ কোন সংস্থা গঠনের পূর্বে জবাবদিহি নেবার বা তদারক করবার ভার আর কারও উপর দেওয়ার প্রশ্ন ছিল একান্ত অবাস্তব।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হল যে, রক্ষণাধীন রাষ্ট্র-সৃষ্টি আপাতদৃষ্টিতে যতটা আকস্মিক ও অভিনব বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। অনেকদিন থেকে আস্তে আস্তে তার প্রতিচিত্র তৈরি হয়েছিল। শুধু প্রয়োগক্ষেত্র ও দায়িত্ব নির্বাহের যোগ্য পাত্রের অভাবে তা কাজে পরিণত হতে পারে নি। শাসকের একাধিপত্য ও যদৃচ্ছা শাসনের অধিকার লোপ, শাসনের মূলনীতির নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, শাসনব্যবস্থাকে চুক্তির দ্বারা সবিশেষ নিরূপণ, শাসনকারীর কাজের জবাবদিহি দাবির ও তত্ত্বাবধানের অধিকার গ্রহণ, এবং শাসনাধীন দেশগুলিকে আখেরে স্বাধীনতাদানের অঙ্গীকার—এইগুলিই হচ্ছে

রক্ষণাধীন দেশশাসন-ব্যবস্থার বিশেষত্ব, যার জন্য মামুলী ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী থেকে তাকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলা হয়।

অধীন দেশে বিজিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যে অধিকার ছিল, তা বর্তেছিল জাতিসঙ্ঘের উপর। তারই প্রতিভূরূপে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র এক বা অধিক দেশের রক্ষণ ও পরিচালনার ভার পেয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে অপরের হাতে না দিয়ে জাতিসঙ্ঘ নিজেই এই দায়িত্ব নিলে হত ভাল। অনুমানটি যুক্তি-সহ বলে মনে হয় না। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে একাধিক জাতির যুগ্ম-শাসন কখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, পরস্পরের মত-বৈষম্যে ও কলহ-বিবাদে অহরহ বিঘ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শাসনকার্যে নবগঠিত জাতিসঙ্ঘের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। শাসকগোষ্ঠী রাতারাতি তৈরি হয় না। বিচক্ষণ কর্মকুশল লোক হয়ত প্রয়োজনমত যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারত, কিন্তু নানা দেশ ও নানা জাতি হতে আহরণ করা বিমিশ্র শাসকসম্প্রদায় আশানুরূপ কার্যকরী হত কি না সন্দেহ। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাবে শাসনযন্ত্র বিকল হবার এমন কি ভেঙ্গে পড়ারও আশঙ্কা ছিল। অধিকন্তু দেশগুলির স্বকীয় জনবল বা অস্ত্রবল নির্ভরযোগ্য ছিল না অথচ জাতিসঙ্ঘের নিজস্বও কিছু ছিল না। সুতরাং এদের প্রতিরক্ষার জন্য অপরের ধার-করা শক্তিই তাকে সম্বল করতে হত। অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার ভাল চলে না, বিশেষতঃ অন্য ব্যক্তিটি যখন সকল সময়ে সকল অবস্থায় তার কাঁধে বন্দুক রাখতে দিতে নারাজ। সুতরাং রক্ষণাধীন দেশের পরি-চালনায় জাতিসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ সংযোগ অসমীচীনই হত বলে মনে হয়। আবার সত্যের খাতিরে এ-কথাও বলা দরকার যে কোন কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্রের তোষণ এবং স্বার্থপূরণও ছিল এই ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্যতম, কারও কারও মতে মুখ্য কারণ।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রক্ষণাধীন দেশের বিধিব্যবস্থা শান্তিবৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরাজিত শত্রুদের সহিত সন্ধি স্থাপন, তাদের অধিকারচ্যুত দেশগুলির বিলিবন্দোবস্ত, রক্ষণাধীন দেশগুলির পৃথক্ পৃথক্ চুক্তিনামার খসড়া তৈরি ও জাতিসঙ্ঘের অনুমোদন লাভ, ম্যাণ্ডেট কমিশন গঠন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমাধা করতে যে বিলম্ব ঘটেছিল, তার ফলে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে ব্যবস্থাটি পূরোপূরি চালু করতে পারা যায় নাই। তখন থেকে একনাগাড়ে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদ অবধি জাতি-সঙ্ঘকে এই দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। কর্তব্য সম্পাদনের ভার ছিল পরিষদের (Council) উপর, কিন্তু তার কাজের ও নীতির সমালোচনা করবার পূর্ণ অধিকার সভাকে (Assembly) দেওয়া হয়েছিল। আলোচনার মাধ্যমে সভা পরিষদকে সদাসর্বদা কাজের নির্দেশ দিত ও কর্তব্যপালনে উৎসাহিত করত; কোন অন্যায় বা অব্যবস্থার তীব্র নিন্দাবাদ করতে কখনও বিমুখ হয় নি। এরূপ আলোচনার ফলে আসলে কাজ যে খুব এগুত এমন নয়, তবে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আলোচিত বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হত এবং তাতে জনমত তৈরি হয়ে উঠত।

কাঠামোটির মূল খুঁটি ছিল স্থায়ী ম্যাণ্ডেট কমিশন। এরূপ একটি কমিশন নিয়োগের বিধান যে অঙ্গীকারপত্রের ২২শ ধারাতে লিপিবদ্ধ ছিল, তা আগেই বলেছি। পরিষদকে উপদেশ, পরামর্শ ও সর্ববিধ সাহায্যদানই ছিল সংস্থাটির একমাত্র কাজ। প্রথমতঃ নয় জন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর দশ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়েছিল।[১] সদস্যেরা সবাই ছিলেন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিচারেই তাঁদের নির্বাচন হত। নির্বাচনের অধিকার ছিল পরিষদের। শাসক ও অশাসক দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিই যাতে সদস্যদের মধ্যে থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা

১. ১৯২৪ খ্রীঃ থেকে একজন অতিরিক্ত সভ্যও ছিলেন।

হত। তবে সকল সময়েই শেষোক্তদের সংখ্যাধিক্য রাখতে হত। নিজের দেশের গভর্নমেণ্টের সঙ্গে যার কোনরকম প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, এমন লোককে সচরাচর সদস্যপদে মনোনীত করা হত না। নিয়োগের পর সদস্যেরা যতদিন ইচ্ছা ততদিনই নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। মৃত্যু বা পদত্যাগ ব্যতীত তাদের কাজের মেয়াদ ফুরাত না।

রক্ষণাধীন দেশ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য বৎসরের পর বৎসর জাতি-সঙ্ঘের দপ্তরে সংগৃহীত ও পুঞ্জীভূত হত। নথিপত্রের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল ন্যাসরক্ষকদের বার্ষিক রিপোর্টগুলি। রিপোর্টগুলি যাতে ঠিকমত লেখা হয়, সেজন্যে বিস্তারিত ফর্মও তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃত তথ্য আহরণের অন্য একটি উপায় ছিল স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে অথবা তাদের বিষয়ে অপরের নিকট হতে পাওয়া আবেদন ও অভিযোগপত্রগুলি। এগুলোর মারফত সাধারণ লোকদের অবস্থা বা দুরবস্থার অনেক কিছু খবরাখবর হামেশা পাওয়া যেত। কেননা তাদের পক্ষে জাতিসঙ্ঘে আরজি দাখিল বা নালিশ দায়ের করার অধিকার দেশের বা দেশের বাইরের যেকোন লোকের ছিল। লোকেরা ও তাদের দরদী বন্ধুরা সুযোগটি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণও করে থাকত। প্রতিকার যে বিশেষ কিছু পাওয়া যেত এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু সাধারণ্যে প্রচার ও আলোচনার ফলে, ভবিষ্যতে যাতে এরূপ অভিযোগের কারণ না ঘটে সে বিষয়ে শাসনকর্তারা হুঁশিয়ার হতে বাধ্য হত। এইটুকু উপকারও একেবারে তুচ্ছ নয়।

কমিশন বসত বছরে দুবার। জুন মাসে ও নভেম্বর মাসে। আবশ্যকমত অতিরিক্ত অধিবেশনও হত। অধিবেশনে প্রতিভূ রাষ্ট্রদের পক্ষে প্রেরিত প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের সাথে স্বতন্ত্রভাবে তার পরিচালনাধীনে যে দেশ তৎসংক্রান্ত বার্ষিক বিবরণী ও দরখাস্ত-গুলি আলোচনা করা হত। প্রতিনিধিদের যদৃচ্ছ প্রশ্ন করবার

অধিকার কমিশনের মেম্বারদের ছিল। অতএব রিপোর্টে যা উহ্য বা অস্পষ্ট থাকত এবং দরখাস্তের সম্পর্কে জিজ্ঞাসার যদি কিছু থাকত সবই সওয়াল-জবাবের মারফত জেনে নেওয়া হত। সময়ে সময়ে জেরার চোটে প্রতিনিধিদের নাজেহাল করতেও কমিশন ছাড়ে নি। তাতে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কখনও হৃদ্যতা ও সমীহের অভাব ঘটে নাই।

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও গভীর বিবেচনার পর কমিশন রিপোর্ট ও দরখাস্তগুলি মন্তব্য ও সুপারিশ সহ পরিষদের কাছে পেশ করত। জবাবে ন্যাসপালদের বলবার কিছু থাকলে তাও কমিশনের কাগজ-পত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। পরিশেষে সবকিছু বিচারবিবেচনা করে পরিষদ রক্ষণাধীন দেশের সরকারকে তাদের বক্তব্য জানাত এবং যেখানে যেমন দরকার সেখানে তদনুরূপ উপদেশ-নির্দেশ দিত। নিজেরা কোন সক্রিয় সাহায্য করত না। পরিষদে ন্যাসরক্ষকদের প্রতিনিধিরাও সভ্য ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের সমান ভোটাধিকার ছিল। অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধ ভোটের জোরে কখনও কোন প্রস্তাব বা সঙ্কল্প বাতিল হয় নাই। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি হত এই যে, এরূপ সম্ভাবনার আশঙ্কায় সেগুলোর খসড়া যথাসম্ভব তাঁদের পছন্দসই করে তৈরি করেই পরিষদে উপস্থিত করা হত।

রক্ষণাধীন দেশ সম্পর্কে কমিশনই যে ছিল জাতিসঙ্ঘের মূল কেন্দ্র, কার্যপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় যা আমরা পূর্বে দিয়েছি তার থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। কমিশনের নিজস্ব কোন কৃত্যক ছিল না; অর্থব্যয় করবার ক্ষমতা ছিল না; ঘটনা-স্থল পরিদর্শন বা সরজমিনে তদন্ত করবার অধিকার ছিল না। বহুবিধ বাধাবিঘ্নে তাদের চলার পথ কণ্টকিত ছিল। তাদের কাজের রীতিও অনেকটা ময়নাতদন্তের মত ছিল। কোন দেশের বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্ট আলোচনা করা হত পরের বৎসরে ছয় থেকে দশ মাস পরে। অপচেষ্টা নিবারণের বা কৃত অপকর্মের আশু

প্রতিকারের সময় তখন অতীত। বস্তুতঃ অন্যায়ের প্রতিরোধ বা প্রতিবিধান কল্পে লীগের তরফে কোন সন্তোষজনক আয়োজন বা ব্যবস্থা মোটেই ছিল না।

সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব সত্ত্বেও কমিশন কর্তব্যনির্বাহে মোটামুটি সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। বিশ্বের জনমতকে জাগ্রত ও সচেতন করে তারই জোরে কাজ উদ্ধার করবার নীতি ও কৌশল তাদের জানা ছিল। তাদের কড়া নজরে শাসকগণ স্বার্থান্বেষণ, যথেচ্ছাচার, ও অন্যায় অবিচার থেকে অনেকটা বিরত ছিল।

কমিশনের বিরুদ্ধে মস্ত বড় অভিযোগ এই যে, জাপান চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে নিজের রক্ষণাধীন দেশগুলিতে অবাধে দুর্গনির্মাণ ও সমরসজ্জা করতে পেরেছিল। তাদের চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়া তাদের অক্ষমতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে মনে হয়, কমিশনের চেয়ে পরিষদই এর জন্য দায়ী ছিল বেশী। কমিশন উপদেষ্টা মাত্র; কাজ করবার দায়িত্ব পরিষদের। কমিশন পরিষদকে ইঙ্গিতে ইসারায় সবই জানিয়েছিল; কিন্তু পরিষদ ছিল উদাসীন। আর পরিষদের সত্যিই বা করবার কি ছিল? যে স্থলে জাপানের মাঞ্চুকো আক্রমণ ও দখল বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই, সেখানে এই-সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে হম্বিতম্বি করার মানেই বা কি হত আর মুখই বা কোথায় ছিল? তারপর আমাদের মনে রাখতে হবে যে জাপান বরাবরই সত্যটিকে গোপন করে এসেছিল। কোন উন্নত সভ্য গভর্নমেণ্ট যে আগাগোড়া এমন ডাহামিথ্যা কথা বলে যেতে পারে, কেউ তা সহজে ধারণা করতে পারে নাই। জাপানে গণতন্ত্রের শিকড় শক্ত ছিল না। সুতরাং সেখানে নিজের দেশের লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলাও সরকারের পক্ষে কঠিন হয় নাই। অপরদিকে পরিদর্শনের ক্ষমতার অভাবে হাতেনাতে ধরে ফেলবার

উপায় কমিশনের ছিল না। ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও জড়িত ছিল। কিন্তু যে দেশ জাতিসঙ্ঘের আওতার বাইরে তাকে সতর্ক করবার দায়িত্ব ত কমিশনের ছিলই না, কোন রাস্তাও ছিল না। জাপানের কারচুপি ও মতলব সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিজেও ছিল অনবহিত এবং সেজন্যই ফন্দিবাজির সুযোগ ও উৎসাহ তার আরও বেড়ে গিয়েছিল। অতএব সব দিক ভাল করে বিবেচনা করে দেখলে কমিশনকে কর্তব্যচ্যুতির জন্য মোটেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

কর্তব্যপালনে কমিশন যথাবিহিত কৃতকার্য হয়েছিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ যেমনই থাক না কেন, একথা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যেতে পারে যে কৃতকার্যে বেশীই হোক আর কমই হোক যা ফল পাওয়া গিয়েছিল তা সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ সদস্যদের নিরপেক্ষতা ও আত্মসংযমের গুণে। আবার মুখ্যতঃ কমিশনের গঠনপ্রণালীর বিচক্ষণতার জন্যেই এরূপ গুণসম্পন্ন সদস্যের নিয়োগ সম্ভবপর ছিল এবং তাঁরাও তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে পেরেছিলেন। তাঁরা ছিলেন স্বদেশের রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য বিশেষজ্ঞ। সময়ে সময়ে নিজ দেশের সরকারের বিপরীত বা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে তাঁরা পিছপাও হন নাই। যেহেতু ভোটের উপর তাঁদের নিয়োগ বা নিয়োগের স্থায়িত্ব নির্ভর করত না, সেজন্য কারও মুখের দিকে চেয়ে তাঁদের কাজ করবার বালাই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বিচারের আসনে সমাসীন হয়েও দোষগুণ বিচারের চেয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের অধিকতর আগ্রহ নিয়ে সংযম ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন বলে তাঁরা কখনও শাসকবর্গের অনাস্থাভাজন হন নাই। নতুবা অনিবার্য বিরোধের ফলে জটিল সমস্যারই শুধু সৃষ্টি হত, এমন কি ব্যবস্থাটি ভেঙ্গেও পড়তে পারত।

কঠোর কর্তব্যের সম্মুখে কিন্তু কমিশন সাহস ও কৃতিত্ব দেখাতে পারে নাই। কেমন যেন একটা ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে। এখানে যে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি

তার থেকেই উক্তিটির সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেই বাধল অমনি প্রশ্ন উঠল, যুধ্যমান জাতিগুলি তাদের রক্ষণাধীন দেশগুলিকেও সঙ্গে জড়াতে পারে কি না। জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত নয়, কাজেই তার এলাকানামাতে যে দেশ শাসিত ও সংরক্ষিত তার অপক্ষপাতিত্ব (neutrality) অবধারিত বলেই মানতে হবে। কমিশনের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এই মতই পোষণ করতেন। তথাপি কমিশন প্রশ্নটির এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উত্তর কখনও দেয় নাই এবং পরিষদকে কিংকর্তব্যেরও কোন পরামর্শ দেয় নাই। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার অবৈধ আক্রমণের প্রতিবিধানে ইটালির উপর অর্থনৈতিক চাপ দেওয়ার কাজে জাতিসঙ্ঘ যখন রক্ষাণাধীন দেশগুলিকেও লাগাবার ব্যবস্থা করেছিল, তখন কমিশনের ইটালিয়ান সভাপতি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই যে রক্ষণাধীন দেশে সকল জাতিরই সমান অর্থনৈতিক অধিকার। অঙ্গীকারপত্রের এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোন অবস্থাতেই তার অন্যথাচরণের উল্লেখ কোথায়ও নেই। উপরন্তু সমদর্শী নীতিটির কোন প্রকার ব্যতিক্রমসাধন রক্ষণাধীন দেশের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে এবং সেজন্য ন্যাসপালের কর্তব্যবিরোধী। কমিশন তাঁর মত সমর্থন করে নাই সত্য, তবুও পরিষদকে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে না দিয়ে প্রসঙ্গটি পরবর্তী বৈঠকে একেবারে ধামাচাপা দিয়ে ফেলা তার পক্ষে কাপুরুষতার সামিলই হয়েছিল।

খাস ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে যে লীগের ম্যাণ্ডেট উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা ছিল, রাজনীতিজ্ঞদের মহলে এই বিশ্বাসটি সাধারণতঃ বদ্ধমূল। তথ্যের বিশ্লেষণ দ্বারা এই মতটি সিদ্ধ হয় নাই। কোন কোন বিশেষজ্ঞ দুয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বটে কিন্তু তাতে কোন স্থির নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না; কারণ মূলে উভয়ের অবস্থার যথেষ্ট তারতম্য ছিল। তবে তাদের আপেক্ষিক গুণাগুণ বিবেচনা করে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যেতে পারে।

ঔপনিবেশিক শাসন ছিল প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে। কালস্রোতে জনমত ক্রমশঃ মানবতান্ত্রিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, পূর্বে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই জনমতকে উপেক্ষা করে, বিশেষতঃ গভর্নমেণ্টের বিরোধীদলের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে, ঔপনিবেশিকদের পক্ষে উন্মার্গগামী হওয়া তত সহজ ছিল না। তথাপি বিদেশে তাদের শাসন অনেক দুষ্কৃতির কালিমায় কলঙ্কিত। নিজেদের সম্বন্ধে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়েও তারা ইতিহাসের এই মুখর ভাষণটি স্তব্ধ করতে পারে নাই। মনে হয় ইতিবৃত্তকথায় এতটা অপবাদের দুর্ভাগ্য তাদের বহন করতে হত না যদি আজকের দিনের মত তাদের সামনে থাকত বিশ্বের অনুমোদিত একটি শাসন-সংহিতা এবং তাদের কাজের কৈফিয়ত তলব করবার জন্যে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কঙ্গোতে ক্ষমতার যে ব্যভিচার চলেছিল, যতটুকু প্রতিরোধ তার সম্ভব হয়েছিল সবটাই আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বে ও প্রচেষ্টায়।[২]

রক্ষণাধীন দেশশাসনের আদর্শ ও সংবিধান যেমনি স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ছিল তেমনি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের দ্বারা সুরক্ষিতও ছিল। এই কারণে এসব দেশের প্রশাসন অন্যান্য অধীন দেশের তুলনায় সাধারণতঃ উন্নততর ছিল। ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাবেক ঔপনিবেশিক শাসনরীতিও ম্যাণ্ডেটনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তার উচ্চতর লক্ষ্য ও কার্যপদ্ধতি বিদেশশাসনের মানদণ্ডরূপে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল। এরূপ পরিবর্তন ও ক্রমোন্নতি এজন্যেই আরো অনায়াসসাধ্য হয়েছিল যেহেতু প্রায় সবক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল। একই রাষ্ট্রের পক্ষে

২. General Act of Berlin, 1885 ; General Act and the Declarations of Brussels, 1890 প্রণয়ন দ্বারা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

স্টিভেনসন রচিত উপাখ্যানের জেকিল (Jekyll) ও হাইডের (Hyde) মত একটি অধীন দেশে উত্তম ও অপরটিতে অধম, এরূপ দ্বিবিধ পরস্পরবিরোধী নীতি দীর্ঘকাল অনুসরণ করা চলে না।

যেমন রাজনৈতিক তেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক প্রশাসন রক্ষণাধীন দেশের পদাঙ্কই অনুবর্তন করেছিল। শ্রমিকদের স্বার্থে ও হিতার্থে যেসব বিধিনিষেধ চুক্তিক্রমে রক্ষণাধীন দেশে পালন করা হত, কালক্রমে আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থার (I. L. O) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিয়ম (International Convention) রচনা করে অন্যান্য অধীন দেশেও তাদের প্রয়োগ করা হয়েছিল। রক্ষণাধীন দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্যেরই ছিল অবারিত দ্বার ও সমান অধিকার। ঔপনিবেশিকেরাও বিশেষ করে ব্রিটেন, হল্যাণ্ড, ও জার্মানি, নিজেদের খাস এলাকার মধ্যে রক্ষণাধীন দেশের দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করতে সুরু করেছিল। কঙ্গো-নদীর অববাহিকায় অবস্থিত গোটা অঞ্চলটিতে উক্ত নীতিটি অবশ্য পালনীয় ছিল এবং অন্যান্য অধীন দেশেও ক্রমে ক্রমে গৃহীত হয়েছিল ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোথায় কতদূর রক্ষিত হত তা সঠিক জানবার উপায় ছিল না। এমন অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে একই রাষ্ট্রের অধীনে পাশাপাশি দুটি দেশ, একটি ম্যাণ্ডেট অপরটি কলোনি, দুটিতে একই বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে ; তত্রাচ প্রথমোক্ত দেশের তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির বহির্বাণিজ্যে অপর দেশের চেয়ে শাসক-দেশের অংশই বেশী।

রক্ষণাধীন দেশশাসনের সব নীতিই যে অন্যান্য অধীন দেশে গ্রহণ করা হয়েছিল এমন নয়। যেমন বলা যেতে পারে, অঙ্গীকারপত্রের ২২শ ধারার ৫ম দফায় বর্ণিত প্রতিরক্ষার বিধি-নিষেধগুলির কথা। রক্ষক যাতে ভক্ষক না হতে পারে, অর্থাৎ প্রতিরক্ষার নামে ন্যাসরক্ষকেরা যাতে অস্ত্রশস্ত্র আহরণ করে এবং অন্যবিধ উপায়ে শক্তি সঞ্চয় করে নিজেদের প্রভুত্ব বা সাম্রাজ্যবিস্তারে

অগ্রসর না হয়, তারই জন্যে এই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। অন্যান্য অধীন দেশগুলিতে এই পথ অনুগমন না করাতে যে কিছু অন্যায় হয়েছিল, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছিল যে ম্যাণ্ডেটগুলির অসহায় অবস্থা শত্রুপক্ষকে আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছিল। আফ্রিকায় এক রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি ছাড়া অন্য সব রক্ষণাধীন দেশই হয় যুদ্ধে বিধ্বস্ত, নয় ত দ্বার-দেশে শত্রুর আবির্ভাবে অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল। ত্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীরা সহজে একথা বুঝতে চায় নি যে তাদের ভালভেবেই যুদ্ধপূর্ব ব্যবস্থায় নিরস্ত্র নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এরূপ দুই একটি ব্যতিক্রমে অবশ্য গোড়ায় যে কথাটি বলেছি তার সত্যতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ঔপনিবেশিক শাসন যথার্থই রক্ষণাধীন দেশের আদর্শকে বরণ করে নিয়ে সাধারণতঃ তারই প্রদর্শিত পথ ধরে চলেছিল।

অসংখ্য অধীন দেশের মধ্যে কয়েকটি মাত্র ম্যাণ্ডেট। তাদের সংখ্যার বা আয়তনের মাপকাঠিতে যে তাদের নব-প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্ব নির্ধারণ করা চলে না, পূর্বালোচনার ফলে সহজেই তা আমাদের বোধগম্য হবে। ঔপনিবেশিক জগতে পুরাতনের উপর নূতনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করে স্যর হার্বার্ট মারের ভাষায় নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, "final repudiation of one system of colonial government, and the definite acceptance of another" পুরাতনের বিসর্জন ও নূতনের আবাহন শুরু হয়েছিল।

রক্ষণাধীন শাসন-সংবিধানের একটা বড় খুঁৎ ছিল কোন কোন বিষয়ে তার অস্পষ্টতা। অন্যান্য অধীন দেশের অধিবাসীদের মত রক্ষণাধীন দেশের লোকদেরও আন্তর্জাতিক আইনের (international law) দৃষ্টিতে নিজস্ব কোন জাতীয় সত্তা (nationality) ছিল না।[৩] কিন্তু অধিপ জাতির জাতীয়তাই যেমন সচরাচর তার

৩. খ ও গ শ্রেণীর রক্ষণাধীন দেশ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য।

অধীনস্থ জাতিতে আরোপিত হয়ে থাকে, রক্ষণাধীন দেশের বেলায় সেরূপ করা বারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণাধীন দেশবাসীদের অবস্থা ছিল অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে ন্যাসরক্ষকের শরণাপন্নই তাদের হতে হত, কিন্তু ন্যাসরক্ষকদের দেশে তারা বিদেশী বলেই গণ্য হত। ফলে সকল রকম সুযোগসুবিধা তারা পেত না। যেমন ধরা যাক ব্রিটেন যদি অপর দেশের সহিত কোন লাভজনক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তার খাসে যেসব অধীন দেশ তারা সবাই লাভের অংশীদার হত কিন্তু শর্তে বিশেষ করে উল্লেখ না থাকলে তার রক্ষণাধীন দেশগুলি সুবিধাটি পেত না। জাতীয়তার এ হেন অনিশ্চয়তার মধ্যে জনসাধারণের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য শিথিল হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ ম্যাণ্ডেটগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অঙ্গীকারপত্রে প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল। কিন্তু ম্যাণ্ডেট কমিশন এ সম্পর্কে কোন সন্দিগ্ধতার অবকাশ রাখতে দেয় নি। স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্রেই তাদের পরিণতি, পরিষ্কার এই মত প্রকাশ করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছিল। কোন রক্ষণাধীন দেশকে সংলগ্ন অন্য একটি অধীন দেশে অন্তর্ভুক্তি অথবা তার সহিত সংযোজনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কমিশন তাতে প্রবল বাধা দিত, প্রধানতঃ এই যুক্তিরই বলে যে তাতে দেশটির বর্তমান স্বতন্ত্রতা ও ভবিষ্যৎ সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবার যথেষ্ট আশঙ্কা বিদ্যমান।

পরিশেষে, রক্ষণাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব বা চূড়ান্ত ক্ষমতা কোথায়—ন্যাসপালের না জাতিসঙ্ঘের হাতে—প্রশ্নটি নিয়ে প্রচুর মতভেদ ছিল। ন্যাসরক্ষকের সার্বভৌমত্বের দাবিকে কমিশন মুহূর্তের জন্যও আস্কারা দেয় নি। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেও ন্যাসরক্ষকের অবস্থা ওঠবন্দী প্রজার মত না তার শর্তাধীন অধিকার স্থায়ী ও অবিসংবাদিত এই পরবর্তী প্রশ্নটির সহজ উত্তর মিলে না। একদিকে যেমন ব্রিটেন প্রমুখ ঔপনিবেশিক দেশগুলি হাতবদলের

প্রসঙ্গটা একেবারে বাজে ও হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিতে চাইলে, অপরদিকে জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি উপনিবেশ-বঞ্চিত রাষ্ট্রগুলি জোরগলায় বলতে লাগল যে অস্থায়িত্বই ম্যাণ্ডেট-শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইসব জটিল সমস্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এবং জাতিসঙ্ঘে বিতর্ক ও আলোচনা যথেষ্টই হয়েছিল কিন্তু সমস্তই নেতিবাচক, ধ্রুব সিদ্ধান্ত কোথায়ও সুপরিস্ফুট ছিল না।

এই অনিশ্চয়তার কুফল যা ফলেছিল তা নেহাত নগণ্য নয়। প্রথমতঃ বিদেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করা তাতে বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছিল এবং মূলধনের অভাবে দেশগুলির আর্থিক প্রগতি মন্দীভূত হয়েছিল। আরও গুরুতর ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল এই যে, রাজনীতিক দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রও তাতে প্রশ্রয় পেয়েছিল। জাতিসঙ্ঘের সদস্যভুক্ত হবার স্বল্পকাল পরেই জার্মানি ট্যাঙ্গানিকা ফিরে পাবার দাবি করেছিল (১৯২৬ খ্রীঃ)। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মান বাসিন্দারা উপনিবেশটি জার্মানিকে প্রত্যর্পণের জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৯৩৩-এর পর নাৎসী গভর্নমেণ্টের সময়ে আন্দোলনটি খুবই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল এবং স্থানীয় জার্মানগণ জার্মানসরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের নির্দেশমত চলতে আরম্ভ করেছিল। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশটির ন্যাসপাল দক্ষিণ আফ্রিকা স্থানটিকে স্বীয় রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করে নেবার দাবি উত্থাপন করল এবং জার্মান চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা তারস্বরে প্রচার করতে লাগল। আজও এর জের মেটে নি।

৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে

দুনিয়াতে স্বাধীনতার অভিযান বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে এসেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মিশর, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি আরব-দেশে, ভারতে, ও তার আদর্শের অনুপ্রেরণায় ব্রহ্মে, সিংহলে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে মুক্তি-সংগ্রামের অদমনীয় শক্তি অর্জনে এবং আফ্রিকা মহাদেশেরও নানা অংশে জাতীয় চেতনার উন্মেষে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোথাও কোথাও ফ্যাসীবাদের প্রাদুর্ভাবে ও উৎপাতে অবস্থার বৈপরীত্য ঘটেছিল। ইউরোপে জার্মানি ও ইটালি যথাক্রমে চেকোশ্লোভাকিয়া ও আলবেনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করেছিল, আফ্রিকাতে আবিসিনিয়া ইটালির কুক্ষিগত হয়েছিল, এবং এশিয়াতে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে সমগ্র চীন জয় করবার জন্যে আক্রমণ চালিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবে ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকাতে, পূর্ব এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বহু স্থান বিভিন্ন শক্তির পদানত হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত বিপর্যয়ই সাময়িক মাত্র। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে অথবা তার অব্যবহিত পরেই ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পেল এবং মাণ্টা ও সাইপ্রাস এই ক্ষুদ্র দুইটি দ্বীপ ব্যতিরেকে অন্য কোথায়ও আর বিদেশী শাসন ছিল না বললেই চলে। এশিয়াতেও কয়েকটি ঔপনিবেশিক পকেট ছাড়া প্রায় সর্বত্র দীর্ঘ দাসত্বপর্বের সমাপ্তি-রেখা অঙ্কিত হল। শুধু সহযাত্রী আফ্রিকার দুঃখ তখনও ঘুচল না। কিন্তু অচিরেই সেখানেও সাম্রাজ্যবাদের বিশাল দুর্গ ধ্বসে পড়তে লাগল।

বিবিধ কারণেই এই অভাবনীয় পরিণতি ঘটেছিল। মৈত্রী ও স্বাধীনতা রক্ষার দোহাই দিয়েই সম্মিলিত মিত্রশক্তি ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল এবং আখেরে জিততে পেরেছিল। আটলান্টিক সনদে (১৯৪১ খ্রীঃ) সকল জাতিরই স্বকীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছিল। ফলে পরাধীন দেশে, বিশেষতঃ আরব, ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে জাতীয় চেতনা পূর্বেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল এবং স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্প ও সংগ্রাম দৃঢ়তর হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলি পরাজিত জাপানের পরিত্যক্ত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে নববলে বলীয়ান হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রায় সবাই, যথা ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস যুদ্ধে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বিধ্বস্ত হয়ে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এরূপ অবস্থায় তাদের পক্ষে বিদ্রোহী জাতিদের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখা বা পুনরায় প্রবর্তন করা অতীব দুঃসাধ্য ছিল। বিশ্বের জনমতও তার প্রতিকূল ছিল। যুদ্ধের সময়ে জয়লাভের জন্য উচ্চ নৈতিক আদর্শের যে জিগির তোলা হয় খানিকটা তার প্রভাবে বা তার নেশার আমেজে এবং খানিকটা যুদ্ধের শোচনীয় ভয়াবহতার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণতঃ একটা ভাবের বন্যা বয়ে থাকে। কিন্তু শুধু এই ক্ষণিক ভাবালুতার বশে শিক্ষিত জনসাধারণ ঔপনিবেশিক সমস্যার সুসমাধানের জন্য ব্যগ্র হয় নাই। ঔপনিবেশিকতার মূলোচ্ছেদ না হলে বিশ্বে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না এই বোধ বা ধারণা ক্রমেই তাদের মনে বদ্ধমূল হচ্ছিল এবং এক্ষণে তারা বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল। জাগ্রত উচ্চকিত জনমতের প্রতীক ও পুরোধা ছিলেন রুজভেল্ট, এটলি প্রভৃতি দূরদ্রষ্টা রাষ্ট্রনেতারা, যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রভাবে ও সক্রিয় সাহায্যে পরাধীনতার অবসান সহজ ও সত্বর হয়েছিল।

বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে একমাত্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতে স্বায়ত্তশাসন দানের ঘোষণার মধ্যে কিন্তু-ভাব ছিল। মিশর সম্পর্কেও কোন স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। অন্যত্র প্রায় সব জায়গাতেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্য আঁকড়ে ধরে ছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষে শুধু ফিলিপাইন নয়, পূর্বোক্ত দেশের অধিকাংশই অভূতপূর্বভাবে বিনা যুদ্ধে ও রক্তপাতে মুক্তি ও স্বরাজ লাভ করেছিল। পূর্বের অনুচ্ছেদে যে সকল যোগাযোগের কথা বলেছি তা না ঘটলে, এরূপ ব্যাপক, আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন কখনই হত না, এ কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যেতে পারে। শুধু দুঃখের বিষয় এই যে কোন কোন দেশ, যেমন ভারত, কোরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ইন্দোচীন, দেশবিভাগের ক্ষতি স্বীকার করেই স্বাধীনতা লাভ করেছিল। এ দুর্ভাগ্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও চক্রান্তেরই বিষফল বা নিষ্ঠুর পরিহাস। কোরিয়া আজ উত্তর ও দক্ষিণ দুটি রাষ্ট্রে খণ্ডিত। খণ্ড দুটির একটি আমেরিকার এবং অন্যটি রাশিয়ার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ; মোহ ও ভ্রান্তি কেটে গেলে কোনদিন হয়ত আবার সংযুক্ত হতে পারে। ইন্দোচীনে ভিয়েৎনামের বর্তমান অবস্থা হুবহু একই এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অবিকল একই আশা পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু মনে হয় ভারত ও প্যালেস্টাইন বিভাগের 'অশুচি কর্দমে'র মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীর 'দস্যু-পায়ের কাঁটামারা' পাদুকা 'চিরচিহ্ন দিয়ে গেল' তাদের 'দুর্ভাগা ইতিহাসে।'

যে দেশগুলি যুদ্ধের পূর্বে শত্রুপক্ষের অধীনে ছিল এবং যুদ্ধের সময়ে তাদের অধিকারে এসেছিল, উপরন্তু যেগুলি আগে জাতি-সঙ্ঘের রক্ষণাধীন ছিল, তাদের সকলের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিরূপণ—এইটে ছিল মিত্র শক্তির সামনে গুরুতর সমস্যা। লড়াই তখন প্রায় খতম হয়ে এসেছে, এমনি সময়ে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা শহরে

রুজভেল্ট, চার্চিল, ও স্ট্যালিন এ সম্বন্ধে এবং পরাধীন দেশ সম্পর্কে সাধারণভাবে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন (ফেব্রুআরি, ১৯৪৫ খ্রীঃ)। ইতিপূর্বেই মস্কো নগরে রাশিয়া, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ও চীন একটি যৌথ রাষ্ট্র-সংস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল (১৯৪৩ খ্রীঃ)। উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করবার জন্যে স্যান-ফ্রেন্‌সিসকোতে একটি রাষ্ট্রসম্মেলন আহ্বানের তোড়জোড় কিছুদিন থেকে চলছিল। ইয়াল্টাতে স্থির হল যে এই সম্মিলনীতেই তাঁদের সুচিন্তিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করা হবে। ৫১টি রাষ্ট্র স্যান-ফ্রেন্‌সিস্‌কোর অধিবেশনে সমবেত হয়ে (এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রীঃ) দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পরাধীন দেশ সম্পর্কে যে নীতি ও ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সনদের (Charter) তিনটি অধ্যায়ে (একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ) তা সন্নিবেশিত হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে সকল পরাধীন দেশে প্রযুজ্য এমন কতকগুলি সাধারণ নীতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বাদশে ও ত্রয়োদশে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (United Nations) হেফাজতে ন্যস্ত দেশ আন্তর্জাতিক অছি হিসাবে পরিচালনা করবার একটি নূতন বন্দোবস্ত (Trusteeship) ছকা হয়েছে।

উপরোক্ত অধ্যায় তিনটির আলোচনা পরে আমরা সবিস্তারে করব। মূল কথাটি এখানে বলা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব পূর্ণমাত্রায় মেনে নিয়েই সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের এই বৃহত্তম সংগঠনটিকে তার কর্তব্য পালন করতে হবে। এই হচ্ছে বিধান। কিন্তু যতদিন প্রতিটি জাতি তার নিজের চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীন-ভাবে বসবাস করবার অধিকার না পাবে, ততদিন উদ্দেশ্য সাধন বিঘ্নিত হবে। এই সত্যের উপলব্ধিবশতঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘ রাষ্ট্রাধীন জাতি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ দায়মুক্ত বোধ করতে পারে নাই। তাই সনদে একদিকে স্বায়ত্তশাসন লাভে অধীন দেশের অধিকার স্পষ্ট

স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে তার প্রস্তুতির জন্য সর্ববিধ দায়িত্ব শাসনকর্তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। বিশ্বশান্তি বিপন্ন হলে বা তদ্রূপ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হলে, প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনানুসারে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পর্যন্ত হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তে সনদের প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারার সপ্তম উপধারাতে রক্ষিত হয়েছে। এই ক্ষমতার সুযোগ রাষ্ট্রসঙ্ঘ গ্রহণও করেছে একাধিকবার। ইন্দোনেশিয়াতে যখন ডাচ গভর্নমেণ্ট বিদ্রোহদমনে অগ্রসর হয়েছিল এবং চারদিকে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল (ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রীঃ), তখন হল্যাণ্ডের সার্বভৌমত্বের তোয়াক্কা না রেখে এবং তার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেখানে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিল। অপরাপর দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনার পর তার প্রভাব ও তৎপরতা পরাধীন জাতির শৃঙ্খল মোচনে কতদূর সহায়তা করেছিল তা সম্যক্ নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। তবে এইটে সুনিশ্চিত যে অধীন দেশ সংক্রান্ত সনদের অধ্যায়ের তিনটি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে পরাধীন জাতিগুলিকে তাদের অধিকারের দাবিতে উদ্দীপিত করেছে এবং পক্ষান্তরে ঔপনিবেশিকদের শুভ চেতনার উদ্রেক করেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠানটিতে এমন সদস্যই বেশী যারা কোন-না-কোন সময়ে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের ভুক্তভোগী, অতএব পরাধীন জাতির দরদী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে তাদের এবং সোভিয়েট রাশিয়াপ্রমুখ রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান আন্দোলন ও চাপ শুধু আন্তর্জাতিক সংস্থাটির অভ্যন্তরে নয়, বাইরে বৃহত্তর জগতেও জনমত উদ্রিক্ত করে সর্বত্র স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা-লাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই পরিবেশে সাম্রাজ্য-বাদের বজ্রমুষ্টি ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়েছে, একে একে বহু দেশ তার হস্তচ্যুত হয়েছে। তৃতীয়তঃ ম্যাণ্ডেটের স্থলে যে সদৃশ ব্যবস্থাটি

(Trusteeship) ইউ-এন-ও তে চালু করা হয়েছে তারও কার্যকারিতা এ বিষয়ে কম হয় নি। পরের অধ্যায়টিতে ব্যবস্থাটির বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, যা পড়লে কথাটার মর্ম ভাল বুঝা যাবে। যেসব পরাধীন দেশ এরূপ ব্যবস্থাধীন হয়েছিল, তাদের অনেকেই এতদিনে স্বাধীন হয়ে জগৎসভায় স্থান পেয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আওতায় পরিচালিত না হলে তাদের মুক্তিলাভ নিশ্চয়ই এতটা ত্বরান্বিত হত না।

পরিশেষে, ইন্দোনেশিয়া, প্যালেস্টাইন, ইটালির উপনিবেশ, প্রভৃতি দেশে সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে জটিলতার গ্রন্থিমোচনে এবং স্বাধীনতার পথে তাদের এগিয়ে দিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ সাহায্য যে কত মূল্যবান হয়েছিল তা সকলেরই সুবিদিত। জাপানের পরাজয়ের পর ইন্দোনেশিয়াতে তার যুদ্ধকালীন সাময়িক প্রভুত্ব লুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে একদিকে স্বদেশী স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের ও অপর দিকে ডাচসাম্রাজ্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল (জুলাই, ১৯৪৭), নিরাপত্তা পরিষদ তখন তৎক্ষণাৎ একটি কমিটি (Good Offices Committee) নিয়োগ করে তারই সাহায্যে যুদ্ধ বেশীদূর অগ্রসর না হতেই তা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর বিবাদ যখন মিটল না, তখনও কমিটি হাল ছেড়ে দেয় নি। অবশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি যখন ডাচ-গভর্নমেণ্ট সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ প্রায় সম্পূর্ণ দমন করে ফেলেছিল, তখন নিরাপত্তা পরিষদই মাঝখানে পড়ে লাগাম টেনে ধরেছিল এবং লড়াই থামিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশু সম্ভাবনা নিঃসংশয়ে অন্তর্হিত হত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী উদ্যম ও প্রযত্নের ফলেই ইন্দোনেশিয়া শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

প্যালেস্টাইনই একমাত্র ক-শ্রেণীর রক্ষণাধীন দেশ যেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষেও স্বাধীন রাষ্ট্রের গৌরব লাভ করতে পারে নাই।

ইহুদী ও আরব এই দুটি জাতির অন্যান্য বিরোধী অপরিতোষণীয় দাবিদাওয়াই ছিল একমাত্র অন্তরায়, যার জন্যে ম্যাণ্ডেটনীতির চরম লক্ষ্যটি অপরিপূর্ণ ছিল। অবস্থাগতিকে ব্রিটেন সমস্যাটিকে ইউ-এন্-এর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল এবং ইউ-এন্-এর নিযুক্ত কমিটির সুপারিশ মাফিক ন্যাসরক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হল। কিন্তু ইউ-এন্ও উভয় জাতির মনস্তুষ্টি করতে সমর্থ হল না। সমস্যাটি অমীমাংসিতই রইল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি দেশটিতে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট অবসিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীরা ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল। আরবেরাও পাল্টা রাষ্ট্র স্থাপন করল। উভয়ের সঙ্ঘর্ষ প্রচণ্ড হয়ে উঠল। মিশরের সহিত ইস্রায়েলের দস্তুরমত লড়াই বেধে গেল। এই ঘোরতর সঙ্কটের মাঝে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অক্লান্ত চেষ্টাই তার প্রথম শহীদ কাউন্ট বার্নাডটের প্রাণোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছিল উভয়ের মধ্যে সন্ধি (truce) স্থাপনে। প্যালেস্টাইনে বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনতাপাশ ছিন্ন হল, যুদ্ধও ক্ষান্ত হল, এ সবই হল, কিন্তু প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হল না। প্যালেস্টাইনের আরবেরা ইস্রায়েল ও জর্ডান এই দুটি রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখনও মনের দুঃখে গুমরাচ্ছে আর তাদের প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলি এই অবস্থার প্রতিকারের কেবলই সুযোগ খুঁজছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আজও সেখানে শান্তিরক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে।

ইটালির প্রাক্তন উপনিবেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্যারিস শান্তিচুক্তি অনুযায়ী কার্যটি নির্বাহ করবার কথা ছিল চতুঃশক্তির (রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স) কিন্তু তাদের মতবৈষম্যের ফলে চুক্তিটির বিকল্প ব্যবস্থা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘকেই এই কাজের ভার নিতে হয়েছিল। দুই বৎসরের মধ্যে লিবিয়ার এবং দশ বৎসরের মধ্যে সোমালিল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছিল। ইরিট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাধীন ইথিওপিয়ার সহিত তার অভিপ্রেত মিলনও ঘটিয়েছিল।

ইন্দোচীনের বিভিন্ন অংশের স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধান অবশ্য ইউ-এন্-ওর মাধ্যমে হয় নি কিন্তু আন্তর্জাতিক সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল।

৭

আন্তর্জাতিক প্রশাসনের নব্য ধারা

অছি বহাল করে দেশ পরিচালনা করবার যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (international trusteeship system) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংবিধানে করা হয়েছিল তা মূলতঃ জাতিসঙ্ঘের রক্ষণাধীন দেশ সৃষ্টি ও তার শাসনব্যবস্থারই (mandate system) অনুবৃত্তি। প্রথমটিতে দ্বিতীয়টির মূল ব্যবস্থা, তার রীতি ও নীতি, সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোন ধারাবাহিক যোগ ছিল না। আইনের দিক দিয়ে এই ফাঁকটির বিশেষ একটি তাৎপর্য ছিল। তা নিয়ে ভবিষ্যতে কোন কোন ক্ষেত্রে যে গোলমাল ও অসুবিধার উৎপত্তি হয়েছিল তার কথা পরে বলব।

মূলতঃ এক হলেও ম্যাণ্ডেট সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের অঙ্গীকারনামা (covenant) এবং ট্রাস্টিশিপ সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনন্দ (charter) এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল।

দলিল দুটিতেই পরিচালনা ব্যবস্থার মোদ্দা কথাগুলিই শুধু ছিল। পরিকল্পিত শাসনপদ্ধতি কোন্ কোন্ দেশে প্রবর্তন করা হবে, কাকে কাকেই বা সেখানে অভিভাবক নিযুক্ত করা হবে, এবং তারা কি শর্তে দেশগুলির শাসন-সংরক্ষণ করবে প্রভৃতি সবিশেষ ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ চুক্তির জন্য রাখা হয়েছিল। ভাবী চুক্তি সম্পাদনেও উভয় ক্ষেত্রে একই পথ অনুসরণ করা হয়েছিল। দুয়েতে তফাত এই যে, অঙ্গীকারনামাতে যা ছিল অস্পষ্ট ও উহ্য, সনদে তার অনেক কিছু অল্পবিস্তর ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন অভিভাবক মনোনয়ন সম্পর্কে প্রথম প্রমাণপত্রটিতে লিখিত কিছুই ছিল না, যদিও ভিতরে

ভিতরে ঠিকই ছিল যে মিত্রশক্তিদের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য ও তাদের যারা সহযোগী তাদের উপরেই এই কাজের ভার দেওয়া হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে এই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার করে বিবৃত হয়েছে। আর একটি প্রভেদ এই যে সনদে এমন বিধানও আছে, যেটি অঙ্গীকারনামাতে ছিল না, যে আবশ্যক হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিজেই পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারবে।

সনন্দে যে বক্তব্য বিষয় অঙ্গীকারনামার তুলনায় আরও বিশদ করে বলা হয়েছে তার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যগণ সার্বভৌম, ও সাম্যের সূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে আলোচ্য আন্তর্জাতিক প্রশাসন ব্যবস্থাটি কোন অবস্থাতেই তাদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য নয়। তথাপি এই সহজসিদ্ধ কথাটি সনন্দে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন ব্যবস্থায় পরিচালনাধীন দেশগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যে দেশের বা যে দেশের অংশবিশেষের সামরিক গুরুত্ব বিদ্যমান (strategic area), তার পরিচালনার রীতি স্বতন্ত্রধরনের করা হয়েছে। কার্যতঃ শ্রেণীবিভাগ যেরূপে নিষ্পন্ন হয়েছিল, তাতে এমন কথা বলা চলে না যে যেগুলিকে অন্য পর্যায়ে ফেলা হয়েছে তাদের সামরিক গুরুত্ব সকল ক্ষেত্রেই ন্যূনতর। তবে প্রয়োজনমত যে কোন স্থান বা তার যে কোন অংশকে যে কোন সময়ে পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভুক্ত করতে আইনকানুনে কোন বাধা নেই। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আন্তর্জাতিক প্রশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে, তাদের অনুমোদনের ভার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) উপর ন্যস্ত। এ সকল অঞ্চলের শাসন-সংরক্ষণের চরম কর্তৃত্বও পরিষদেরই। মনে পড়বে যে জাতিসঙ্ঘের আমলে রক্ষণাধীন দেশগুলির পরিচালনার ঝুঁকিও ছিল একটি সঙ্কীর্ণ সংগঠনের অর্থাৎ লীগ পরিষদের (League Council), বৃহত্তর সভার

(League Assembly) নয়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ব্যতীত অন্যত্র অনুসারী দায়িত্ব পালনের ভার সাধারণ সভার (General Assembly) উপরে অর্পিত হয়েছে। এই পার্থক্যটি বিশেষ লক্ষণীয়। চুক্তির সম্পাদন ও অনুমোদনের বিষয়ে অঙ্গীকার-নামাতে ও সনন্দে আর একটি সামান্য বিভিন্নতা আছে। কোথায়ও ম্যাণ্ডেটের শর্ত পূর্বে স্থির করা সম্ভবপর না হলে, লীগ পরিষদের উপরই ছিল তার নির্ধারণের ভার। কিন্তু সনন্দে সাধারণ সভাকে কিংবা নিরাপত্তা পরিষদকে এরূপ কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, পরিচালনা নীতির দুই একটি বৈলক্ষণ্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অঙ্গীকারনামাতে ছিল অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রের প্রতি সব অবস্থাতেই সমব্যবহারের অলজ্ঘনীয় নির্দেশ। নীতিটি সমদর্শী হলেও সমফলপ্রসূ হয় নি। সাধারণতঃ বাণিজ্য-প্রধান রাষ্ট্রগুলির সুবিধাই তাতে হয়েছিল। সময়ে সময়ে পরিচালনাধীন দেশগুলির আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল। তাই সনন্দে অবস্থাবিশেষে সম-ব্যবহার-নীতির ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ হয় নাই। বরং এরূপ নীতির প্রয়োগে যদি পরিচালনাধীন দেশটির কোনরূপ স্বার্থহানি ঘটে অথবা জগতে অশান্তির উদ্রেক হয়, তাহলে নীতিটি বর্জন করারই বিধান আছে।

প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কেল্লা তৈরি করার এবং দেশের বাইরে সেনা পাঠাবার বা কাজে লাগাবার যে বিধিনিষেধ আগে অঙ্গীকার-নামাতে ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, সনন্দে সেগুলো ত পরিত্যক্ত হয়ই নি, পরিবর্তে বিপরীত নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় দেশগুলি যাতে যথাসাধ্য সাহায্য দান করতে পারে, সেজন্য তাদের সামরিক শক্তি তদুপযোগী করে গড়ে তোলাই পরম কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে ভারত ও রাশিয়া এরূপ পরিবর্তনের ঘোরতর বিপক্ষে ছিল।

পরিচালনা-নীতির তারতম্যের আলোচনা প্রসঙ্গে পরিচালনা-রীতির প্রভেদের কথাও বলা দরকার। রক্ষণাধীন দেশগুলির পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা জাতিসঙ্ঘের ছিল না। ফলে তার তত্ত্বাবধানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে নি, পূর্বেই আমরা তা বলেছি। সনন্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কর্মস্থল পরিদর্শন করবার অপ্রতিহত অধিকার প্রদত্ত হয়েছে।

চতুর্থতঃ, অছি-পরিষদের (Trusteeship Council) করণীয় কাজ যদিও প্রায় ম্যাণ্ডেট কমিশনের মতই, কিন্তু ইউ-এন-ওতে তার স্থান লীগে ম্যাণ্ডেট কমিশনের নির্দিষ্ট স্থানের চেয়ে উচ্চে এবং তার গুরুত্বও বেশী। কারণ কমিশন ছিল লীগের অধীনে নিম্নতর স্তরের উপাঙ্গ বৈ নয়। পক্ষান্তরে অছি-পরিষদ ইউ-এন-ওর অন্যতম প্রধান অঙ্গ। পরিচালক রাষ্ট্রদের (Administering Authority) প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেবার যে অধিকার দ্বিতীয়টির আছে, প্রথমটির তা ছিল না।

উভয়ের গঠনও একরূপ নয়। অছি-পরিষদের সভ্য হচ্ছে আসলে রাষ্ট্র—নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনের অধিকারী রাষ্ট্র, অছির কর্তব্য পালনে নিযুক্ত রাষ্ট্র, এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রদের নির্বাচিত প্রতিনিধি রাষ্ট্র—এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পক্ষে যাঁরা পরিষদের অধিবেশনে বসেন তাঁরা কমিশনের মেম্বারদের মত স্ব-স্ব-প্রধান ব্যক্তিবিশেষ নন, নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় সরকারের নিযুক্ত আজ্ঞাধীন প্রতিনিধিমাত্র। দুয়েতে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈষম্য এই যে কমিশনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অপেক্ষা অন্য রাষ্ট্রের সদস্যের সংখ্যা ছিল বেশী আর পরিষদে উভয়ের সংখ্যা সমান। সংখ্যার অনুপাতের এই নিয়মটি আগেরবারেও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, এখনও তাই।

পরিশেষে, দেশগুলির ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে নির্দেশক পত্র দুটির মধ্যে যে সামান্য ইতরবিশেষ দেখা যায় তাকে নগণ্য বলে

তুচ্ছ করা যায় না। আন্তর্জাতিক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাটি উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্বর্তী মাত্র। যথাসময়ে অভিভাবকত্বের সমাপ্তি এবং অধীনতার বন্ধন হতে যথার্থ মুক্তিদান উভয় ব্যবস্থারই কাম্য। পার্থক্য কেবল এই যে, পরিণামে স্বাধীনতার সহিত স্বাতন্ত্র্যদানই ম্যাণ্ডেট-নীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল ; কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের উৎপত্তি সুফলদায়ক হয় নাই এই বিবেচনায় সনন্দে স্বাতন্ত্র্যের বিকল্পে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দানের বিধানও আছে।

নয়া বন্দোবস্তটি আগেরবারের মত এবারেও চালু করতে যা মনে করা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লেগেছিল। বরং এবারে মিত্রশক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ এবং সামরিক অভিপ্রায় নিয়ে গভীরতর মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। ফলে জার্মানির সহিত সন্ধির মারফত শান্তিস্থাপন (Peace Treaty) আজ পর্যন্তও সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের অনুগত সহযোগী রাষ্ট্র সমেত তুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ঠাণ্ডালড়াই চলছে। এবারকার যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি এত বেশী ঘোরাল ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক প্রশাসনের নূতন পরিকল্পনাটি যে একেবারে ভেস্তে যায় নি তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, ১৯১৯ সালে যেমন সন্ধিস্থাপনের সঙ্গে রক্ষণাধীন দেশ গঠনের ব্যবস্থাটিকে জড়ান হয় নি, এবারেও তেমনি বিষয় তুটিকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। তাই সম্ভব হয়েছিল শত কলহ-বিবাদের মধ্যেও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আটটি দেশকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দায়িত্বে পরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পাদন। সর্বসম্মতিক্রমে না হলেও—রাশিয়াপ্রমুখ কতিপয় সদস্য গুটিকয়েক আইন ও রাজনীতির প্রশ্ন তুলে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেছিল—যথারীতি চুক্তিগুলি অনুমোদন লাভ করেছিল।

আটটি দেশের সব কটিই ছিল জাতিসঙ্ঘের আমলের রক্ষণাধীন

দেশ। পূর্বে যে রাষ্ট্র যে দেশের ভার পেয়েছিল, এবারেও সেই রাষ্ট্র সেই দেশের অছি (Trustee) নিযুক্ত হল। যথা ব্রিটেন অছি হল ট্যাঙ্গানিকা, টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনের ; ফ্রান্স—টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনের অপর অংশের ; বেলজিয়াম—রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডীর ; নিউজিল্যাণ্ড—পশ্চিম স্যামোয়ার ; এবং অস্ট্রেলিয়া—নিউগিনির। অন্যান্য রক্ষণাধীন দেশগুলির মধ্যে একে একে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান ইতিপূর্বেই স্বাধীন হয়েছিল। ইহুদী-আরব দ্বন্দ্বে প্যালেস্টাইনের সমস্যা হয়ে উঠেছিল বিষম জটিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে জাপানের রক্ষণাধীন দেশগুলিতে তখনও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের সময়কার সামরিক শাসনের জের চলছিল। অনতিকাল পরেই শেষোক্ত দ্বীপগুলি আন্তর্জাতিক অছি-ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রই তাদের অছি নিযুক্ত হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার দিক দিয়ে দ্বীপগুলির সমধিক সামরিক গুরুত্ব আছে, এরূপ সাব্যস্ত হওয়ার ফলে, তাদের সম্পর্কে যে চুক্তি নিষ্পন্ন হল সনদের যথাবিহিত ধারা অনুসারে সাধারণ সভার পরিবর্তে নিরাপত্তা-পরিষদে তার অনুমোদন হল। চুক্তির শর্ত মোটামুটি অন্যান্য চুক্তির মতই। ব্যতিক্রমের মধ্যে লক্ষণীয় : প্রথমতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে সম-ব্যবহার-নীতি পরিহার করা হয়েছে। দ্বীপগুলিতে বিধিসম্মতভাবেই যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের দেশের কারবার ও কোম্পানিকে বিশেষ সুবিধা দিতে পারবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের লোকেদের প্রতি পক্ষপাত দূষণীয় আচরণ হবে না। অদ্যাবধি যুক্তরাষ্ট্র শর্তটির সুযোগ গ্রহণ করে নাই ; গ্রহণ করবার কোন আগ্রহ বা অভিপ্রায় তার নাই এ কথাই বারবার বলে এসেছে। কিন্তু তার মতে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য শর্তটি বজায় রাখা খুবই দরকার। দ্বিতীয়তঃ চুক্তিতে অছিকে এই বিশেষ অধিকারটি দেওয়া হয়েছে যে সে তার ইচ্ছামত দ্বীপগুলির যে কোন অংশ আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে।

এই শর্তটির জোরে যুক্তরাষ্ট্র বিকিনি (Bikini) ও এনিওয়েটক (Eniwetok) এই দুটি অবালে (Atoll) রাষ্ট্রসজ্যের পরিদর্শন প্রতিরোধ করেছে।

আর একটি রক্ষণাধীন দেশেও অচিরেই নূতন ব্যবস্থাটির প্রবর্তন করা হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যথাবিধি চুক্তি সম্পাদনের পর এবং সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে প্রশান্ত মহাসাগরের নারু দ্বীপটি আন্তর্জাতিক ন্যাসে (international trusteeship) রূপান্তরিত হল। অতীতে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার উপর ছিল এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির পরিচালনার ভার, নূতন বন্দোবস্তেও তাই বহাল রইল।

বাকী রইল শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, যার ন্যাসরক্ষক দক্ষিণ আফ্রিকা নানাবিধ টালবাহানা করে দেশটির নব রূপায়ণে বাধা দিতে লাগল। আজ পর্যন্তও দেশটিকে আন্তর্জাতিক হেফাজতের গণ্ডীর মধ্যে আনতে পারা যায় নি।

রক্ষণাধীন দেশ ব্যতীত অপর দুই শ্রেণীর দেশেও, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শত্রুর কবল হতে মুক্ত দেশগুলিতে এবং দ্বিতীয়তঃ দখলকারের ইচ্ছায় তার অধীন যে কোন দেশে এই আন্তর্জাতিক শাসন-সংরক্ষণ ব্যবস্থাটির প্রয়োগের বিধান আছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কোন রাষ্ট্র তার অধীনস্থ কোন দেশকে রাষ্ট্রসজ্যের জিম্মায় তুলে দেয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সকল দেশ শত্রুদের হাতছাড়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে কেবলমাত্র ইটালির প্রাক্তন উপনিবেশ সোমালিল্যাণ্ডকেই এরূপ ব্যবস্থাধীন করা হয়েছিল। যদিও উপনিবেশটি যুদ্ধের মধ্যে যুক্তরাজ্যের দখলে এসেছিল, তবুও বিজিত শত্রুরাষ্ট্র ইটালিকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে তার অছি মনোনীত করা হয়েছিল, প্রধানতঃ এই বিবেচনায় যে দেশটির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল তারই বেশী। অছিকে সাহায্য ও উপদেশ দেবার জন্যে কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রেই একটি ছোট পরিষদ গঠিত

হয়েছিল কলম্বিয়া, মিশর, ও ফিলিপাইনস এই তিনটি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে। অছির মেয়াদ ছিল দশ বৎসর, তার পরেই অর্থাৎ ১৯৬০ সালে দেশটি স্বাধীনতা পাবে গোড়াতেই এরূপ স্থির করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য কোন দেশেরই স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল নির্ধারিত ছিল না। তারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হয়েছিল।

এরূপে আফ্রিকার এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গোটাকয়েক অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সাতটি রাষ্ট্রের হাতে গচ্ছিত হল। নীচের তালিকায় তাদের ও তাদেব পরিচালক রাষ্ট্রের নাম পাশাপাশি সাজিয়ে দেখান হল।

গচ্ছিত দেশ (Trust Territory)	**পরিচালক রাষ্ট্র** (Administering Authority)
আফ্রিকা :—	
১। ক্যামেরুন—(ব্রিটিশ)	যুক্তরাজ্য
২। টোগোল্যাণ্ড (ব্রিটিশ)	”
৩। ট্যাঙ্গানিকা (ব্রিটিশ)	”
৪। ক্যামেরুন (ফরাসী)	ফ্রান্স
৫। টোগোল্যাণ্ড (ফরাসী)	”
৬। রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	বেলজিয়াম
৭। সোমালিল্যাণ্ড	ইটালি
প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল :—	
৮। নিউগিনি	অস্ট্রেলিয়া
৯। নারু	” (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তরফে)
১০। পশ্চিম স্যামোয়া	নিউজিল্যাণ্ড
১১। ক্যারলিন, মেরিয়ানা ও মার্শাল ইত্যাদি ২৫টি দ্বীপপুঞ্জ	যুক্তরাষ্ট্র

উপরে উল্লিখিত দেশগুলির মোট আয়তন জাতিসঙ্ঘের রক্ষণাধীন দেশগুলির সমষ্টিগত আয়তনের তুলনায় কিছু কম। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফে এদের তদারকের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি লীগের সময়ে যেমন ছিল মোটামুটি তেমনই আছে, একথা আগেই বলেছি। খবরদারির কাজে ম্যাণ্ডেট কমিশনের জায়গা নিয়েছে অছি-পরিষদ, প্রসঙ্গতঃ তাও পূর্বে বলা হয়েছে। ন্যাসরক্ষকদের প্রেরিত বার্ষিক রিপোর্ট ও জনসাধারণের নিকট হতে পাওয়া লিখিত আবেদন ও অভিযোগগুলিই ছিল কমিশনের কার্যনির্বাহের প্রকৃত সম্বল। অছি-পরিষদের কাজের উপকরণও প্রধানতঃ তাই। এগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও মূলতঃ একই প্রণালীতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রশ্নোত্তরেরও বিশেষ কিছু রকমভেদ দেখা যায় না।

নূতন বিধানে পরিদর্শক পাঠিয়ে দেশগুলির সম্যক্ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শকমণ্ডলী নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কোন্ কোন্ রাষ্ট্র থেকে পরিদর্শক নিয়ে একটি মণ্ডলী গঠিত হবে, অছি-পরিষদে প্রথমে তা ঠিক করা হয়। যেসব রাষ্ট্র পরিষদটির সদস্য, তাদের থেকেই বাছাই হয়ে থাকে। অপর রাষ্ট্রের নিয়োগে কোন বাধা নেই বটে; কিন্তু তা না করবার কারণ এই যে দায়িত্ব যাদের তাদেরই সকলের আগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাওয়া দরকার।

নিযুক্ত রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি মনোনীত করে পরিষদে নাম পাঠিয়ে দেয়। পরিষদ মনোনীত প্রতিনিধিদের একটা কেতাদুরস্তি অনুমোদন দিয়ে থাকে। সুতরাং বাহ্যতঃ তাঁরা পরিষদের প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ হলেও কার্যতঃ নিজ নিজ গভর্নমেণ্টের মতাবলম্বী হতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় পরিদর্শক-মণ্ডলীতে মতের সাম্য ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার জন্যে শাসন-ভার-প্রাপ্ত রাষ্ট্র ও তদ্ভিন্ন অন্য রাষ্ট্র, এই দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রের সংখ্যার

সমতা রক্ষা করার রেওয়াজ বরাবর চলে এসেছে। যে দেশটি পরিদর্শন করা হবে, তার অছিকে স্বভাবতঃই পরিদর্শকদের মধ্যে স্থান দেওয়া নিষিদ্ধ। পরিষদে যে রাষ্ট্রের যিনি প্রতিনিধি, তিনিই অথবা তাঁর অনুকল্প, কিংবা সংশ্লিষ্ট কোন উপদেষ্টা সেই রাষ্ট্রের পক্ষে সচরাচর পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কখন কোন্ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কোন্ দেশ পরিদর্শনে নিযুক্ত হয়েছেন, পরিশিষ্ট (ক) পাঠে জানা যাবে।

এক-একটি দেশ পরিদর্শন করা হয় দুই বৎসর অন্তর অন্তর এবং একাদিক্রমে দুই তিন মাস পরিদর্শনের কাজ চলে। সামরিক ঘাঁটি ব্যতীত অন্য যে কোন জায়গা দেখবার অবাধ অধিকার পরিদর্শকদের আছে। পরিদর্শনের সময়ে অধিবাসীদের যাচন-পত্র গ্রহণ ও তাদের বক্তব্য শ্রবণ এবং সময়সাপেক্ষে পরিষদের দপ্তরে প্রেরিত দরখাস্তগুলির সরজমিনে তদন্ত করাও তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, কর্তব্য সম্পাদনে এক-দিকে যেমন পরিদর্শকেরা পরিচালকদের কাছ থেকে বিরোধিতার পরিবর্তে সহযোগিতাই পেয়েছেন, অপরদিকে পরিদর্শকদের ব্যবহারে ও কার্যকলাপে পরিচালকদেরও আপত্তি বা প্রতিবাদের কোন কারণ ঘটে নাই। দুই পক্ষের সহযোগিতায় দেখাশুনার কাজ এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালভাবেই চলেছে। তবে কেউ কেউ বলেন—কথাটা একেবারে অসত্যও নয়—যে পরিদর্শন করবার বা আবেদন ও অভিযোগ শুনবার সময়ে কার্যস্থলে পরিচালকরাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতিবশতঃ স্থানীয় লোকেরা নির্ভীক মতামত ও সত্য কথা প্রকাশ করতে প্রায়শঃ ভয় পেয়ে থাকে। অন্যদিকে আবার মুশকিল এই যে, প্রতিপক্ষের অসাক্ষাতে কেবল একতরফা শুনেও ত কিছু করবার উপায় নেই।

পরিদর্শনের ফলে তত্ত্বাবধান যে কত সুকর ও সুপটু হয়, তা বোধ হয় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। দেশের ও দশের

সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় ও সংযোগস্থাপন না করে অলক্ষ্যে দূর থেকে যে তত্ত্বাবধান চলে তাতে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি না ঘটেই পারে না। অবশ্য দু-তিন মাস সময়ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ব্যাপক পরিদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সময়ের অপ্রতুলতার অনুযোগ পরিদর্শকদের কারও কারও কাছ থেকে কখন-সখন শুনা গিয়েছে। সময় বাড়িয়ে দেবার জন্যে সাধারণ সভাও ব্যগ্র। কিন্তু প্রতিবন্ধক এই যে, প্রচুর সময় দেবার মত অবকাশ আছে এমন যোগ্য পরিদর্শক পাওয়া বড়ই দুষ্কর। যাহোক, দু-তিন মাস সময়ের মধ্যেও যে অনেক মূল্যবান প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হতে পারে, পরিদর্শকদের রিপোর্টগুলি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অছি-পরিষদের অধিবেশনে যখন কোন দেশের বার্ষিক রিপোর্টের নিয়মানুগত পরীক্ষা ও আলোচনা চলে, তখন আলোচনাধীন দেশ সম্পর্কে পরিদর্শকদের কোন রিপোর্ট থাকলে তা-ও সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পরিষদের অধিবেশন হয় সাধারণতঃ বৎসরে দুই বার, জানুআরি ও জুন মাসে। পালাক্রমে শাসক ও অশাসক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পরিচালকদের রিপোর্ট ও পরিদর্শকমণ্ডলীর রিপোর্ট দুটি রিপোর্টই এক সঙ্গে পর্যালোচনা করে, পরিষদ প্রয়োজনবোধে পরিচালক রাষ্ট্রকে যথাকর্তব্যের আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে থাকে। আইনতঃ যদিও পরিচালকেরা এরূপ আদেশ বা নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়, তথাপি এ যাবৎ তারা পরিষদের কথামত কাজ করবার দিকেই প্রবণতা দেখিয়েছে বেশী। মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পরিদর্শকদের ব্যক্ত মত ও উপদেশ অনুসরণ করেছে, পরিষদের অনুশাসনের অপেক্ষা করে নাই।

কমিশনের সঙ্গে পরিষদের কার্যপদ্ধতির আরও দু-একটি বৈসাদৃশ্যের কথা বলা যেতে পারে। লোকেদের বক্তব্য কমিশনের কাছে লিখে পেশ করতে হত, নতুবা গ্রাহ্য হত না। পরিষদ কিন্তু

শুরু থেকেই মৌখিক আরজি ও নালিশ শুনবারও রীতি চালু করেছে। দ্বিতীয়তঃ, লিখিত দরখাস্তগুলির বিবেচনা ও বিচার কমিশন দরখাস্তকারীর অসাক্ষাতেই করত। উভয় পক্ষের জবানি সাক্ষাৎ শুনবার কোন দস্তুর তাদের ছিল না। পক্ষান্তরে অছি-পরিষদের দপ্তরে যেসব লিখিত দরখাস্ত এসে পৌঁছে, অনেক সময়েই তাদের শুনানি হয় ঘটনাস্থলে। পরিদর্শকদের উপরই এই কাজের ভার পড়ে। ফলে অভাব-অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের যে শুধু সুবিধা হয়েছে তা নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘও সাথে সাথে জনসাধারণের বেশী আস্থাভাজন হতে পেরেছে।

এমনিভাবে কাজের গণ্ডী বাড়িয়ে নেওয়াতে ও পুরান নীতির সংস্কারের ফলে পরিষদের কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার গঠনতন্ত্রটি কমিশনের গঠনতন্ত্রের থেকে যেভাবে বদলানো হয়েছে, তাতে ফল তেমন ভাল হয় নি। অছি-পরিষদের সদস্যরা ম্যাণ্ডেট কমিশনের সভ্যদের ন্যায় বিশেষজ্ঞ নন। তাঁরা স্ব স্ব রাষ্ট্রেরই মুখপাত্র। অতএব পক্ষপাতিত্বহীন বিশ্লেষণ ও বিচারের চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক মত জাহির করবার দিকেই তাঁদের ঝোঁক বেশী। নিজেদের কাজের ধারাকে যেন তেন প্রকারেণ সমর্থন করাতেই যেমন তাঁদের বিশেষ আগ্রহ, অন্যেরাও আবার তেমনি তাঁদের ছিদ্রান্বেষণে সতত ব্যস্ত। পরিষদে তাই কমিশনের শান্ত পরিবেশের একান্ত অভাব। তার অধিবেশনগুলিতে আকছার দ্বন্দ্ব-কোলাহল চলছে। রাজনৈতিক কলহের তিক্ত রেশ সভাকক্ষে যেন লেগেই আছে। এত যে বাদবিসংবাদ, তবু যাহোক সভার কাজ পরস্পরের বোঝাপড়া ও রফা-নিষ্পত্তির মধ্যে একরকম নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয়েছে। কখনও অচল অবস্থার উদ্ভব হয় নি।

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভিন্ন অন্যান্য গচ্ছিত দেশের তদারকে অছি-পরিষদ ও সাধারণ সভা উভয়কেই সনন্দে সহ-অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনে প্রথমটি

দ্বিতীয়টির কর্তৃত্বাধীন। পরিষদে সাধারণতঃ ঔপনিবেশিকদের মত ও স্বার্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কাজেই সংস্থাটি যে বিপুলসংখ্যক ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী রাষ্ট্রে গঠিত সাধারণ সভার বিশ্বাসভাজন হতে পারে নি, তাতে আর আশ্চর্য কি? পরিষদের কাজে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে না পেরে, সভা স্বয়ং গচ্ছিত দেশগুলির তদ্বিরে সাক্ষাৎ-ভাবে লিপ্ত হয়েছে। পরিষদে যেসব আবেদন ও অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বা যেগুলির ফয়সালা আবেদন ও অভিযোগ-কারীদের সন্তোষ জন্মাতে পারে নাই, সভার বৈঠকে তাদের পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি পরিষদকে ডিঙ্গিয়ে যেসকল দরখাস্ত ও নালিশ সরাসরি সভার বরাবরে দাখিল হয়েছে, সেগুলো সভা অগ্রাহ্য না করে শুনেছে। ক্রমে পরিষদের চেয়ে সভার কাছেই লোকেরা তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানিয়েছে বেশী। তাতে এই সত্যটিই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পরিষদের উপর অধীন দেশের লোকেদের যথোচিত ভরসা বা বিশ্বাস নেই। অধিকন্তু, পরিষদকে সভা সময় ও প্রয়োজনমত নানাপ্রকার নির্দেশ দিয়ে এসেছে, কখনও কখনও পরিষদকে এড়িয়ে সোজাসুজি পরিচালক রাষ্ট্রকে অথবা পরিদর্শকমণ্ডলীকে তার অনুশাসন জানিয়ে দিয়েছে।

সভার মত সাধারণতঃ অধিকতর অগ্রসর। অনেক ক্ষেত্রেই পরিষদের সহিত তার মতের মিল ঘটে নাই। কিন্তু দুয়ের মতবিরোধ নানা কারণে প্রায়ই বেশীদূর গড়াতে পারে নাই। একটি বড় কারণ এই যে, দুই-তৃতীয়াংশ অনুকূল ভোটাধিক্য ব্যতীত কোন প্রস্তাব সভাতে গৃহীত হতে পারে না। বিষয়টি ভাল করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গচ্ছিত দেশবাসীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থাপনায় পরিষদের অপেক্ষা সভা, সঠিক বলতে গেলে সভার অধিকাংশ সভ্য, অনেক বেশীদূর এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সভার অধিবেশনে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ

ভোটের চেয়ে মাত্র একটি ভোটের কমতিতে তাদের সদভিপ্রায় পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। পরিষদের মতই শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের সুবিধার জন্য যখন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাঙ্গানিকাতে বহু আদিবাসীদের উৎখাত করা হয়েছিল, তখন তাদের অভিযোগের বিচারে পরিষদ মূল অন্যায়টিকে অসঙ্কোচে স্বীকার করে নিয়ে উদ্বাস্তুদের জন্য খেসারত মঞ্জুর করেছিল। সাধারণ সভার বহু সদস্য এই সিদ্ধান্তটির তীব্র সমালোচনা করে বাস্তু-হারাদের জমি ফিরিয়ে দেবার পক্ষেই সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছিলেন। চতুর্থ (রাজনীতিক) কমিটিরও সুপারিশ ছিল তাই। কিন্তু প্রবল মতাধিক্য সত্ত্বেও আবার ঠিক একই কারণে অর্থাৎ সভাতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সামান্য অভাবে তাদের সাধু সঙ্কল্পটি শেষকালে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভাগাদের বাস্তুভিটা আর তাদের ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে মতের সাম্য ছিল, সেখানে আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্রতর বিষয়ে বৈষম্যের উপর স্বভাবতঃই তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, গচ্ছিত দেশগুলিতে শারীরিক দণ্ডবিধান রহিত করবার যৌক্তিকতা সাধারণ সভা ও অছি-পরিষদ উভয়েই নির্বিরোধে মেনে নিয়েছিল বলে যে স্থলে সভা কালক্ষেপ না করে অবিলম্বেই কুপ্রথাটি দূর করতে চেয়েছিল অথচ পরিষদ মোটেই তার সঙ্গে পা ফেলে সমতালে চলে নাই, সেস্থলে সেজন্য কোন জটিলতার উৎপত্তি হয় নাই বা উষ্মার কারণ ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে কালক্রমে সমস্যাটির সঙ্গে গভীরতর পরিচয়ের ফলে মতের ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে কিংবা মীমাংসা সহজ হয়েছে। আফ্রিকাতে ইউজাতির একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের যে প্রশ্নটি একদা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, সেইটেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাতিটি

তদানীন্তন ব্রিটিশ ও ফরাসী টোগোল্যাণ্ড এবং গোল্ড কোস্ট এই তিনটি দেশে ছড়ান ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাদের স্বকীয় রাষ্ট্র স্থাপনের জোর দাবি উঠেছিল। দাবিটি সাধারণ সভার পোষকতা লাভ করেছিল এবং ফলে পরিষদের সহিত তার মতান্তর উপস্থিত হয়েছিল। সভা পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইউদের মতের ঐক্য ছিল না। পাল্টা দাবিগুলো নিয়ে যারা একই সময়ে আন্দোলন চালিয়েছিল, তাদের পেছনে জনসমর্থনও বড় কম ছিল না। সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ ক্রমশঃ উদঘাটিত হওয়ার ফলে, গোড়াগুড়িতে সভা ও পরিষদের মধ্যে যে মতের অমিল হয়েছিল, তা স্থায়ী হয় নাই এবং শেষকালে নির্বিবাদেই বিষয়টির মীমাংসা হতে পেরেছিল।

পরিশেষে বলা দরকার যে সভাও সকল সময়ে পরিষদকে তার স্বতন্ত্র মত ও নীতির জন্য ঘাঁটাতে চেষ্টা করে নাই। গচ্ছিত দেশগুলিতে পরিচালক রাষ্ট্রের পতাকার পরিবর্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পতাকা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করে সভা পরিষদকে তদনুযায়ী নির্দেশ দিয়েছিল। পরিচালক রাষ্ট্রদের প্রচণ্ড আপত্তি লক্ষ্য করে পরিষদ নির্ধারণটিকে এমনভাবে বদলে নিয়েছিল যাতে দুই কুলই রক্ষা হয়। ব্যবস্থা হয়েছিল যে, ইউ-এন-এর পতাকার সহিত পরিচালক রাষ্ট্রের পতাকাও, এবং গচ্ছিত দেশটির যদি নিজস্ব কোন পতাকা থাকে তবে তিনটি নিশানই, একসঙ্গে উত্তোলন করা হবে। বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সভা এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা সমীচীন মনে করে নাই। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু আলোচনাটিকে নিরর্থক দীর্ঘ করতে চাই না।

পক্ষান্তরে ক্ষেত্রবিশেষে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থেকে সভা পরিষদকে আপন মতের বশবর্তী করেছে, এরূপ উদাহরণও বিরল নয়। রক্ষণাধীন দেশের সহিত সংলগ্ন অন্য অধীন দেশের আংশিক বা সামগ্রিক যুগ্ম প্রশাসনব্যবস্থা জাতি সঙ্ঘের আমলে ছিল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পত্তনের পর তার উপদেশ বা অনুমতি না নিয়ে যখন অছি-রাষ্ট্রদের কেউ কেউ কোথায়ও কোথায়ও এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আরম্ভ করেছিল, তখন তাতে যাতে গচ্ছিত দেশের তত্ত্বাবধানের কাজে কোন ব্যাঘাত না ঘটে বা তার স্বার্থের কোন হানি না হয়, সেজন্য সাধারণ সভা ও অছি-পরিষদ উভয়েই পরিচালক রাষ্ট্রদের অবশ্য অনুষ্ঠেয় কয়েকটি নীতি ও নিয়ম স্বতন্ত্রভাবে স্থির করে দিয়েছিল। দুয়ের মধ্যে সভার নীতি ও নিয়মগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাপক ও কঠোর। প্রথমে কিছুকাল পরিষদ সভার নির্ধারণকে উপেক্ষা করে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছিল কিন্তু শেষকালে সভার পীড়াপীড়িতে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী অধিকতর যত্ন, সতর্কতা ও দৃঢ়তা অবলম্বন না করে পারে নাই। আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। গচ্ছিত দেশগুলি বছরে বছরে স্বরাজের পথে কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে এবং কবে পর্যন্ত পূর্ণ স্বরাজলাভের উপযুক্ত হবে, সভা যখন পরিচালক রাষ্ট্রদের অসহযোগিতার ফলে তাদের নিকট থেকে এই সমস্ত অভীপ্সিত খবর তাদের দেয় বার্ষিক রিপোর্টের মারফত আদায় করে উঠতে পারছিল না, পরিষদ তখন প্রথমে সভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে নাই বা তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে নাই; কিন্তু পরে সভার একান্ত গোঁ দেখে ধীরে ধীরে সহযোগিতার পথে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

মতবিরোধ থেকে অদ্যাবধি কখনও বিষম সঙ্ঘর্ষ বা সঙ্কটের উদ্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে যে হবে না এমন কথা কি বলা যায়? অছি-পরিষদ সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীন হলেও সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন নয়; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তার একটি নিজস্ব বিশিষ্ট সত্তা ও অধিকার আছে, যার জন্যে তার ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করবার ক্ষমতা সভার নাই। মতদ্বৈধ ঘটলে পরিষদের মতই যে সর্বথা বর্জনীয় এবং সভার মত গ্রহণীয়,

আইনের কড়া বিচারে এ কথাটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলবার জো নেই। অপর পক্ষে কি আইনের দিক থেকে কি রাজনীতির দিক থেকে পরিষদ সহায়হীন; সভার বিরুদ্ধে লড়াই করে তার স্বস্তি কোথায়?

পরিষদের নির্দিষ্ট কাজে সভা প্রায়শঃ অকারণ ও অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করে থাকে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির এইটে হচ্ছে একটা বড় অভিযোগ। তারা মনে করে যে পরিষদকে এভাবে হেনস্তা না করে বরং গচ্ছিত দেশের সকল ব্যাপারেই তার অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করাই সভার লক্ষ্য হওয়া উচিত। আবার এ কথাও অস্বীকার্য যে পরিচালক রাষ্ট্রদের বাধা ও আপত্তির মুখে পরিষদ যথোচিত দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায় সভার ব্যতিচার যেমন পরিষদকে বিব্রত করেছে তেমনই আবার সময়ে সময়ে তাকে কর্তব্যপালনে প্রণোদিত ও উৎসাহিত করেছে, একাধিক দৃষ্টান্তে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যে সকল রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই তাই গচ্ছিত দেশের দেখাশুনার কাজে সভার প্রত্যক্ষ সংযোগই সমর্থন করে থাকে।

পরিষদ ও সভার এরূপ দ্বন্দ্ব অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই। পরিষদকে নাস্তানাবুদ ও অপদস্থ করে সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বরং বহির্জগতে পরিষদ যতই হীন প্রতিপন্ন হবে, ততই তার দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা ও শক্তি হ্রাস পাবে। সভার মত একটা প্রকাণ্ড সংস্থার পক্ষে তার বহুবিধ দায়িত্বের মধ্যে এবংবিধ একটি অতিরিক্ত কঠিন দায়িত্ব যথাযথরূপে নির্বাহ করাও অসম্ভব। অতএব উভয়ের কাজের একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ প্রয়োজন। বিভাগটি যত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত হবে, দুয়ের ঐক্যও তত পরিস্ফুট হবে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানও সুবিহিত ও সুশৃঙ্খল হবে না।

দ্বন্দ্বের গোড়াতে রয়েছে পরিচালক রাষ্ট্রদের সাবেকী ঔপনিবেশিক মনোভাব। সোভিয়েট-গোষ্ঠীর সহিত মতের সঙ্ঘর্ষে তাদের

গোঁড়ামি আরও বেশী প্রকট ও অনমনীয় হয়েছে। তাদের মত পরিষদকে যতই প্রভাবান্বিত করেছে, সভাও ততই পরিষদের প্রতি বিরূপ হয়েছে এবং সভার বৈঠকে পরিচালকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা ততই তীব্র ও কঠোর হয়েছে। পরিচালকদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর যথোচিত পরিবর্তন না ঘটলে, আন্তর্জাতিক অছি-সংস্থা সুসম্পূর্ণ হবে না।

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির বেলায় সভার স্থলে নিরাপত্তা পরিষদের উপরেই অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত আছে, পূর্বেই এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে। এই দায়িত্বটি পালন করার ব্যাপারে তার কোনরূপ গরজ দেখা যাচ্ছে না। এ সম্পর্কে অছি-পরিষদের কাজের পুনর্বীক্ষণ তার অন্যতম কর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত আছে। কিন্তু কর্তব্যটি নির্বাহ করবার কোন চেষ্টা অদ্যাপি তার পক্ষে হয় নাই। এমন কি অছি-পরিষদের প্রেরিত রিপোর্ট পর্যন্ত কখনও সেখানে আলোচনা করা হয় নাই। নিরাপত্তা পরিষদের ঔদাসীন্যের ফলে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির হেফাজত প্রকৃতপক্ষে অছি-পরিষদেই সম্পূর্ণরূপে বর্তেছে। কারও কারও মতে সম্পাদিত চুক্তির ত্রয়োদশ ধারার বলে সাধারণ সভারও নাকি অঞ্চলগুলি তত্ত্বাবধান করবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে। কিন্তু অনুমানটি প্রামাণ্য বলে মনে হয় না। অন্ততঃ সভা এ বিষয়ে আজও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। আগেই বলেছি যে অছি-পরিষদ সচরাচর পরিচালক রাষ্ট্রের বাধা ও আপত্তি অতিক্রম করে কর্তব্যপথে অগ্রসর হতে পারে নি এবং যেখানে যতটুকু পেরেছে তা সাধারণতঃ পেছন থেকে সভার জোর পেয়ে অথবা তার ঠেলা খেয়ে। সুতরাং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে কেবলমাত্র তার একার পক্ষে দায়িত্বপালন ও কর্তব্যসম্পাদন কতই বা নির্ভরযোগ্য হতে পারে?

উপসংহারে বলতে হয় যে দোষত্রুটি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক প্রশাসন-ব্যবস্থা দ্বারা গচ্ছিত দেশগুলির নানাবিধ উপকারই সাধিত হয়েছে।

প্রথমতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রথা, কৃষি ইত্যাদির লক্ষণীয় উন্নতি সর্বত্রই সাধিত হয়েছে। এই উন্নতিসাধনে I. L. O., UNESCO, WHO প্রভৃতি অনেক সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপদেশ ও সহযোগিতা অছি-পরিষদের বেশ কাজে এসেছে। দুঃখের বিষয় এদের সহযোগিতার সুযোগ এখনও পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করা হচ্ছে না, করলে কাজের নিশ্চয়ই আরও সুরাহা হত এবং দেশগুলির আরও শ্রীবৃদ্ধি হত। দ্বিতীয়তঃ, শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ অধিকার ও সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির পথ একেবারেই বন্ধ হয়েছে। তৃতীয়তঃ, কোন দেশের প্রশাসন যেখানে পার্শ্ববর্তী অন্য উপনিবেশের সহিত সংযুক্ত, সেখানে গচ্ছিত দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে। সর্বোপরি স্থানীয় অধিবাসীরা অধিক হতে অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে অবিরাম গতিতে স্বরাজের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন দেশ ইতিমধ্যে স্বাধীনতা পেয়েওছে, যেমন ১৯৬০ সালের গোড়ায় ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড, মাঝামাঝি সময়ে সোমালিল্যাণ্ড, পরবর্তী বৎসরের শেষভাগে ট্যাঙ্গানিকা, তার পরের বৎসরের আদ্য ও মধ্যভাগে ক্রমানুসারে পশ্চিম স্যামোয়া এবং রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডী।[১] এই অজ্ঞাত দেশগুলিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে নিখিল জগতের দৃষ্টির সমক্ষে স্থাপন করে বিশ্বের জনমতকে উদ্বুদ্ধ না করলে তাদের দুরূহ সমস্যাগুলির এত সত্বর সুসমাধান নিশ্চয়ই হত না। পরিচালক রাষ্ট্রদের পশ্চাতে আন্তর্জাতিক অছি-সংস্থার প্রেরণা বা তাড়না না থাকলে এবংবিধ প্রগতি কিছুতেই সঙ্ঘটিত হত না।

লীগের আমলে ম্যাণ্ডেট কমিশনের পরামর্শে ও সহায়তায় তত্ত্বাবধানের কাজ চলেছে পূর্বাপর একইভাবে, সুশৃঙ্খল রীতিতে কিন্তু ঢিমেতালে। ইষ্টকে পাওয়ার চেয়ে অনিষ্টকে ঠেকিয়ে রাখার দিকেই

---

১. দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে এবং স্বাধীন উরুণ্ডীর নূতন নামকরণ হয়েছে বুরুণ্ডী।

কমিশনের তৎপরতা ছিল বেশী। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় কাজ চলেছে ঝগড়াঝাটির ঝড়ঝাপটার মধ্যে। কখনও এগিয়ে গেছে দ্রুতপদে, কখনও মন্থরগতিতে, কখনও বা থেমে থেমে। বিতর্কের বিদ্যুৎ-স্ফুরণে বিদেশী শাসনের ঢাকা দেওয়া গলদগুলিতে রূঢ় আলোক পড়েছে বিশ্বের চকিত দৃষ্টির সামনে। দুই বিপরীত শক্তির টানা-টানির অন্তে জয় হয়েছে রক্ষণশীলের চেয়ে প্রগতিশীল মতের এবং নঞর্থকের চেয়ে সদর্থক নীতিরই।

ভাল করে খতিয়ে দেখলে মনে হয়, সুচারু কার্যনির্বাহের জন্য অতীত ও বর্তমান উভয় প্রণালীর সুসমন্বয় স্পৃহনীয়। প্রতিনিধি-পদে কেবল যদি বিশেষজ্ঞেরই নিয়োগ হয়, তাতে করে অছি-পরিষদ আরও কার্যদক্ষ এবং সকলের বিশ্বাসভাজন হবে। আর যদি পরিষদের কাজে সাধারণ সভার সন্তুষ্টি হয় ও আস্থা জন্মে, তবে দ্বিতীয় সংস্থাটি বাঁধাধরা সকল কাজ প্রথমটির হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারবে এবং পুনরীক্ষণ, বিশেষ বিশেষ সমস্যার মীমাংসা, অত্যয়ের প্রতিবিধান প্রভৃতি বৃহত্তর কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে। দুয়ের মধ্যে এরূপ শ্রমবিভাগ কেবল যে উপযোগী তা নয়, সহজসাধ্যও বটে। আইনকানুনের কোন বাধা এতে নেই। এই প্রয়োজনীয় সংস্কারটি সাধিত হলে চলতি আন্তর্জাতিক প্রশাসন-ব্যবস্থাটি সুসমঞ্জস হবে এবং তার বিভিন্ন অঙ্গের ঐক্য পরিপূর্ণ তাৎপর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে।

৮

ঔপনিবেশিক শাসনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা

জাতিসঙ্ঘের সরকারী তালিকা অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালীন অধীন দেশের সংখ্যা ছিল ১১৮ বা তারও কিছু বেশী। আমরা জানি যে তাদের মধ্যে মাত্র ১৪টি ছিল জাতিসঙ্ঘের রক্ষণাধীন। বাদবাকি সবই ছিল তার জিম্মা ও এখতিয়ারের বাইরে। তাদের আন্তর্জাতিক খবরদারির কোন প্রশ্ন তখনও তেমনভাবে উঠে নাই। অধীন দেশ মাত্রেই ম্যাণ্ডেট-নীতি প্রয়োগের মহত্তর আদর্শের গুঞ্জন ইউরোপের শ্রমিকমহলে শুনা যাচ্ছিল বটে; কিন্তু ভার্সাইর শান্তিবৈঠকে এই ধরনের কোন কথার আলোচনা এমন কি অঙ্গুলিসঙ্কেত পর্যন্ত কখনও হয় নি।

জাতিসঙ্ঘের অঙ্গীকারনামার ২৩শ ধারাতে শ্রমিক, অস্ত্র-ব্যবসায়, বিষাক্ত ভেষজ পদার্থ, পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে অবশ্য এমন কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিধান ছিল যা সকল দেশে সুতরাং আনুষঙ্গিকভাবে অধীন দেশেও প্রযুজ্য ছিল। এগুলো ছিল বিগত শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সন্ধিসমূহের জের এবং এগুলোকে অবলম্বন করে জাতিসঙ্ঘের দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব রক্ষণাধীন ছাড়া অন্যান্য অধীন দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছিল। এই ধারাটির (খ) উপধারাটি কিন্তু ছিল খানিকটা স্বতন্ত্র ধরনের। উপধারাটিতে বলা হয়েছে যে, লীগের সকল সদস্যই তাদের অধীন বা আশ্রিত দেশের অধিবাসীদের প্রতি বর্তমানে গৃহীত বা পরে চুক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী ন্যায্য আচরণ করতে প্রতিশ্রুত। কেবলমাত্র পরাধীন জাতির স্বার্থেই উপধারাটি

সাধারণভাবে মূল ধারাটিতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সুতরাং এইটেকেই আমরা ঔপনিবেশিক শাসনক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানের প্রথম বীজ বপন বলতে পারি।

'ন্যায্য আচরণ' যে কি তা অঙ্গীকারনামায় কোথায়ও বুঝিয়ে বলা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় রক্ষণাধীন দেশ সম্পর্কে ২২শ ধারাতে যে নীতি লিপিবদ্ধ হয়েছিল, অন্যান্য অধীন দেশ সম্পর্কে সদৃশ নীতির অনুসরণই যথার্থ আচরণ, এই অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। কিন্তু এই যুক্তিটি শাসক রাষ্ট্রগুলির কেউই মানতে রাজী হয় নি। যা হোক অন্য একটি কারণে উপধারাটির অস্তিত্ব একান্তই নিরর্থক হয়ে পড়েছিল। গোড়াতেই তর্ক উঠেছিল যে, অন্যান্য কোন কোন উপধারাতে জাতিসঙ্ঘের হাতে দায়িত্ব অর্পণের কথাটি যেমন স্পষ্ট লেখা, এইটেতে ত তেমন কিছু নেই; আছে শুধু স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের কথা, তাও নির্ধারিত ও পরস্পর সম্মত গণ্ডীর মধ্যে, তার বাইরে নয়। মতটির খণ্ডনে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল এই যে, একে সত্য বলে মেনে নিলে উপধারাটি উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। যেকালে রক্ষণাধীন দেশে বিশেষ দায়িত্ব জাতিসঙ্ঘের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, সেকালে অন্যান্য অধীন দেশেও শাসিতদের স্বার্থরক্ষার অন্ততঃ একটা সাধারণ গোছের দায়িত্ব ও অধিকার দেবার সঙ্কল্প বা অভিপ্রায় একান্তই স্বাভাবিক। অন্যথা উপধারাটির উৎপত্তির কারণ কীই বা হতে পারে এবং কেনই বা তা অঙ্গীকার-নামাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল? বস্তুতঃ টীকাটিপ্পনী যেরূপই হোক না কেন, আর কোন সদর্থ এইটের হতে পারে না।[১] পরিতাপের

---

১. সমর্থনে Duncan Hall-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২২৬ পৃষ্ঠায় J.M. Yepes ও Pereira da Silva বিশেষজ্ঞদ্বয়ের উদ্ধৃত মতটি নিম্নে লিপিবদ্ধ হল। "The most recent commentary on the Covenant by J. M. Yepes and Pereira da Silva took the view that on a proper construction of the article the League had a general compe-

বিষয়, এতৎসত্ত্বেও প্রথমোক্ত অনুদার ব্যাখ্যাটিই জাতিসঙ্ঘে প্রাধান্য পেয়েছিল।

(খ) উপধারাটি ত এমনি ভাবেই বানচাল হয়ে গেল। কিন্তু রোপিত বীজটি একেবারে বরবাদ হয় নি। ইউ-এন্ এর সনদের এগার অধ্যায়ে বীজটিকে আমরা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত দেখতে পাই। স্ব স্ব রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসন-হীন দেশগুলির পরিচালনায় দেশীয় লোকেদের স্বার্থই সর্বাগ্রগণ্য এবং সর্বতোভাবে তাদের কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের পবিত্র কর্তব্য বলে অধ্যায়ের সূচনাতেই ঘোষিত হয়েছে। এই গুরুতর কর্তব্য কি ভাবে নির্বাহ করতে হবে, তাও সবিশেষ বিবৃত হয়েছে। শাসন-ক্ষমতার যাতে কোন অপব্যবহার না হয় এবং সকল সময়ে ও সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ আচরণের দ্বারা প্রজাদের রঞ্জন করা হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ; জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিয়য়ক উৎকর্ষ-সাধন করা ; এজন্যে প্রয়োজনমত অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা ; সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদের স্বায়ত্তশাসন লাভের পথ সুগম ও প্রশস্ত করা, মোদ্দা কথায় এই হচ্ছে নির্দিষ্ট কার্যক্রম।

উপরন্তু, নিজ নিজ অধীন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও প্রশাসনিক তথ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবগতির জন্য তার মুখ্য সচিবের নিকট নিয়মিত প্রেরণের দায়িত্বও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের উপর রক্ষিত হয়েছে। এই নিয়মটির

---

tence unless this had been modified or negated by some international convention." তাঁদের প্রণীত Commentaire the´oriqe et pratique du Pacte de la Socie´te´ des Nations et des Statuts de l´Union Paname´ricaine, Tome III, (1939) পুস্তকের ২৪৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে।

নিষেধগুলিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। প্রথমতঃ, রাজনীতি-সম্পর্কিত সংবাদসরবরাহের ব্যবস্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ, অন্য কোন বিষয়ও যদি দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নের সহিত জড়িত অথবা তার সংবিধানবিরুদ্ধ হয়, তাহলে সে সম্বন্ধেও খবর বা বিবরণ পাঠাবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অধিকন্তু, প্রেরিত বিবরণ কেবলমাত্র বিজ্ঞপ্তির জন্য; তাতে অধীন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রবেশাধিকার সুস্পষ্টরূপে সূচিত হয় না।

একাদশ অধ্যায়টিকে আমরা আন্তর্জাতিক অছি-ব্যবস্থা বহির্ভূত অধীন দেশগুলির হকিয়ৎ-নামা বলে আখ্যায়িত করতে পারি। পরিচালনার নীতি ও আদর্শ উভয়বিধ অধীন দেশেরই এক। তবুও দুয়ের মধ্যে কয়েকটি বৈষম্য সহজেই চোখে পড়ে।

স্বায়ত্তশাসন, বিকল্পে স্বাধীনতালাভ গচ্ছিত দেশের অভীষ্ট। দ্বাদশ অধ্যায়ে এরূপ বিহিত আছে। কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে স্বায়ত্ত-শাসনই চরম লক্ষ্যরূপে বিবৃত হয়েছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তি অন্যতর উদ্দেশ্য এমন কথা বলা হয় নাই। ঔপনিবেশিকদের প্রভাবেই এরূপ উল্লেখ সম্ভবপর হয় নি। খাসদখল একেবারে হাতছাড়া হতে দিতে তখনও তারা অতিশয় নারাজ।

দ্বিতীয়তঃ, দুটি অধ্যায়েই যদিচ ইউ-এন্ এর দপ্তরে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবার বিধান আছে, কিন্তু রিপোর্টে কি কি বিবরণ দিতে হবে তা নিয়ে দুয়ের মধ্যে তারতম্য করা হয়েছে। গচ্ছিত দেশের সকলরকম হালচালের খবরাখবর দেওয়ারই নির্দেশ আছে; কিন্তু অন্যান্য অধীন দেশ সম্পর্কে যাতে অপ্রীতিকর কোন আলোচনার উপলক্ষ বা সুযোগ না ঘটে, সেজন্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য কোন কোন প্রসঙ্গকে বাদ দিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যতিক্রমটি নিয়ে বিশেষ করে অনেকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নানা বৈঠকে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা চলেছে। অবশেষে স্থির হয় যে কোন পরিচালক রাষ্ট্রের পক্ষে স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক সমাচার পাঠাবার অন্ততঃ কোন

বাধ্য থাকবে না। কিন্তু মুখ্য সচিব (Secretary General) এরূপ বার্তা বিশ্লেষণ না করে তার চুম্বকটি শুধু ইউ-এন্-ওর সম্মুখে স্থাপন করবে এবং তা নিয়ে কোন আলোচনা করা বা সঙ্কল্প গ্রহণ করা চলবে না। কিন্তু সামাজিক বিবরণ হিসাবে মানুষের সাধারণ অধিকার, দণ্ডবিধি ও তার প্রয়োগ ইত্যাদি অনেক রাজনীতি-ঘেঁষা বিষয়ের বৃত্তান্তও ক্রমে পরিচালকদের বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোন্ অধীন জাতি কতদূর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছে এবং কোথায় কি পরিমাণে স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান (free political institutions) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এসব বিষয়ের সংবাদও শনৈঃ শনৈঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের নিকট তলব ও আদায় করতে চেষ্টা করেছে।

রিপোর্টগুলির সমীক্ষা ও পর্যালোচনা ও তদনন্তর যথাকর্তব্য স্থিরীকরণের বিধান এবং তদুদ্দেশ্যে অছি-পরিষদ নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে, আন্তর্জাতিক প্রশাসনের নব্য ধারা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব পরিচ্ছেদে তা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে একাদশ অধ্যায়ে এমন কোন সংস্থার পরিকল্পনা দূরে থাক্, প্রাপ্ত রিপোর্টগুলি নিয়ে কি করা হবে এই নিতান্ত দরকারী বিষয়টি সম্বন্ধে পর্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। মহাফেজখানার তাকে সাজিয়ে রাখবার জন্য অবশ্য রিপোর্টগুলি নয়, এ কথা না বললেও চলে। অনেক বাদানুবাদের পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে সাধারণ সভাতে সাব্যস্ত হয়েছিল যে, রিপোর্টগুলির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করা হবে এবং সেগুলি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ও ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি তদর্থক কমিটি (Ad Hoc Commitee) গঠিত হবে।

নিউজিল্যাণ্ড ব্যতীত সকল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই কমিটি গঠনের প্রতিকূল ছিল। যে রিপোর্ট রাজনীতি-বিবর্জিত ও সম্পূর্ণ

টেকনিক্যাল তার যাচাই মহাকরণের (Secretariat) বিশেষজ্ঞ আধিকারিকদের (officers) দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও বিধিসম্মত। সেজন্য মোটেই কোন কমিটি গঠনের প্রয়োজন নেই। এই ছিল ঔপনিবেশিকদের আপত্তির প্রথম কারণ। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এগার অধ্যায়ে কমিটি গঠনের কোন উল্লেখ নাই, সেই হেতু কমিটির নিয়োগ তাদের মতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দের লঙ্ঘনেরই নামান্তর মাত্র। একটু ভেবে দেখলেই বেশ বোঝা যাবে যে আপত্তিগুলির ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল। সনন্দের ৪র্থ পরিচ্ছেদের ২২শ ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, সাধারণ সভা তার কাজের সুবিধার জন্য স্থায়ী অস্থায়ী যে কোন কমিটি নিয়োগ করতে পারবে। আর কমিটি যদি আবশ্যক বোধ করে, তা হলে ত চাওয়ামাত্র মহাকরণের বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ও অন্যবিধ সাহায্য অনায়াসেই পেতে পারে। আসল কথা এই যে, ঔপনিবেশিকেরা তাদের অধীনস্থ দেশগুলির কোন ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রের কটাক্ষপাত বরদাস্ত করতে পারত না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট কোনরূপ জবাবদিহিরও তারা ঘোরতর বিরোধী ছিল।

ঔপনিবেশিকদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কমিটির মেয়াদ পুনঃ পুনঃ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে কমিটিটি অস্থায়ী হলেও আজও বিদ্যমান আছে। একাধিকবার এর নামান্তর ঘটেছে। বর্তমানে বার্তা কমিটি (Commitee on Information) এই নামে পরিচিত। ভারত ও অন্যান্য ঔপনিবেশিকতা-পরিপন্থী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কমিটিটিকে স্থায়ী করবার চেষ্টা যে না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি যদিও বা অনিচ্ছায় কমিটির সহিত সাময়িকভাবে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছিল, তার স্থায়িত্ব মেনে নিতে তাদের ছিল দারুণ আপত্তি। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ও যুক্তরাজ্য ত একেবারে জিদ ধরে বসেছিল যে স্থায়ী করা হলে কমিটিটিকে তারা বয়কট করবে। তাই যে সব রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিকে

স্থায়ী করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তারা শেষ পর্যন্ত হাত গুটাতে বাধ্য হয়েছিল।

অছি-পরিষদের মত বার্তা কমিটিও সম-সংখ্যক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক-ইতর রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে গড়া হয়ে থাকে। সভাপতি নির্বাচিত হয় দুয়ের মধ্যে পালা বদল করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি যাতে থাকে, তার দিকে নজর রেখেই কমিটি তৈরি করা হয়। বৎসরে একবারই তার বৈঠক হয়ে থাকে। কালে কালে তার কার্যের ও ক্ষমতার পরিধি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে বটে কিন্তু মূলতঃ আদি তদর্থক কমিটির মতই আছে। অর্থাৎ মুখ্য সচিব কর্তৃক সম্পাদিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের রিপোর্টগুলির সার-সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ বিশেষ নিযুক্তকদের (Specialised Agencies of the United Nations) মারফত পাওয়া তথ্যাদি, এগুলো সাধারণ সভাকে পরিবেশন এবং তৎসম্পর্কে পরামর্শদানই হচ্ছে তার প্রধান কাজ। অধিকন্তু বিশেষ কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ভারও সময়ে সময়ে তার উপর পড়ে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের অনুবর্তনের উদ্দেশ্যে বার্তা কমিটিও অছি-পরিষদের ন্যায় রির্পোট তৈরি করবার একটি প্রমাণ ফর্ম (standard form) বেঁধে দিয়েছে। রিপোর্টগুলির আলোচনার সময়ে কোন একটি বিশেষ দেশ সম্বন্ধে চর্চা করা বা উপদেশ দেওয়া কমিটির পক্ষে বারণ। এই অদ্ভুত নিয়মটির কারণ, ঔপনিবেশিকদের ধারণা যে এরূপ আলোচনায় বা উপদেশদানে দেশটি যে রাষ্ট্রের অধীন তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয়। যা কিছু আলোচনা বা পরামর্শ তা হতে হবে সমষ্টিগতভাবে, উপনিবেশগুলির নির্বিশেষ সাধারণ সমস্যা ধরে। ফি-বছর একসঙ্গে সকল বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে একটা তালগোল পাকিয়ে যাবার ভয় থাকে। তাই কমিটি অর্থ, সমাজ, ও শিক্ষা এই তিন শ্রেণীর এক একটি বিষয়ের আলোচনা এক এক বৎসর পর্যায়ক্রমে করে থাকে।

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণে স্পষ্টই দেখা গেল যে, গচ্ছিত দেশে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যতটা অধিকার ও ক্ষমতা পেয়েছে, অন্যান্য অধীন দেশে ততটা নয়। অধিকার ও ক্ষমতার এই সঙ্কীর্ণ বেড়কে যথাসম্ভব কাটিয়ে দুয়ের মধ্যে ব্যবধান যতটা পারা যায় ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা রাষ্ট্রসঙ্ঘে বারবার হয়েছে, কিন্তু সফল হয় নি। ব্যর্থ প্রয়াসের দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দেশগুলিতে মাঝে মাঝে সফরে যাওয়া, সেখানকার লোকেদের অবস্থা ঘুরেফিরে দেখা, তাদের আরজি নেওয়া ও শুনা, গচ্ছিত দেশ সম্পর্কে এই ধরনের চলতি রেওয়াজগুলি অন্য সব অধীন দেশেও চালু করতে রাশিয়া ও সমভাবাপন্ন আরও কতিপয় রাষ্ট্র খুবই চেষ্টা করেছিল কিন্তু পেরে উঠে নি। উপনিবেশগুলির ব্যষ্টিগত বিচার ও সমালোচনার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রযত্নও ঠিক একই কারণে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ও তাদের মতানুবর্তীদের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে ফলপ্রসূ হতে পারে নি। ভারত প্রস্তাব করেছিল যে সনদের ৭৭ (১) গ ধারার অনুবর্তী হয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমুদয় যেন স্বেচ্ছায় স্ব স্ব অধীনস্থ দেশগুলি রাষ্ট্র সঙ্ঘের হেফাজতে হস্তান্তর করে। প্রস্তাবটি সঙ্ঘের চতুর্থ অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কীয় কমিটিতে গৃহীত হওয়ার পর দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের ন্যূনতায় সাধারণ সভাতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। অন্যান্য অধীন দেশগুলিকে গচ্ছিত দেশের সামিল করবার যত সব নিস্ফল উদ্যম হয়েছিল, তাদের মধ্যে ভারতের এই উদ্যোগটিই সকলের চেয়ে সুদূরপ্রসারী ও উল্লেখযোগ্য।

বেশ সাবধান হয়েই বার্তা-কমিটি এ যাবৎ তার কাজ চালিয়ে এসেছে। কর্তব্যের ত্রুটির জন্যে অনেক সময়েই ঔপনিবেশিকদের নিন্দাবাদ করতে বাধ্য হলেও, নিজের নির্দিষ্ট অধিকারের সীমা কদাপি ডিঙ্গিয়ে যায় নাই। অনাবশ্যক রাজনীতির চর্চা করা, কোন একটি উপনিবেশকে উপলক্ষ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা, মুখ্য সচিবের সঙ্কলিত চুম্বকটিকে পেরিয়ে মূল রিপোর্টগুলির অনুশীলন করা প্রভৃতি

নিষিদ্ধ পথ মাড়াতে কখনও চেষ্টা করে নাই। কমিটির বক্তব্য বিষয় সাধারণ সভাতে পেশ হবার আগে চতুর্থ কমিটিতে বিবেচিত হয়ে থাকে। উক্ত কমিটিতে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী রাষ্ট্রেরই আধিক্য ও প্রাধান্য। সুতরাং সেখানে সময়ে সময়ে বার্তা-কমিটির মত ও সুপারিশ অগ্রাহ্য হয়েছে, তাদের মধ্যে যে বিষয়ে আদৌ কোন আলোচনা হয় নাই, এমন বিষয়েও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টির প্রভাব নেহাত নগণ্য ছিল না। এ কথা অসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, দ্বিতীয়টির প্রভাবে প্রথমটি সংযত ও সতর্ক হয়েছে। সাধারণ সভাও সচরাচর বার্তা-কমিটির মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই প্রস্তাব বা সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। সেখানে ঔপনিবেশিক ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী—এই দুই পক্ষের তুমুল কলহের ফলে মধ্যপন্থীদের মধ্যস্থতায় কখনও কখনও বিবাদ-ভঞ্জন ও আপস-মীমাংসা হয়েছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই হয় নি। দ্বিতীয় পক্ষের অভীষ্ট সিদ্ধির মস্ত বড় অন্তরায় ছিল দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজনীয়তা।

একাদশ অধ্যায়ে স্বায়ত্তশাসন-হীন দেশের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্ণয় করা হয় নাই। গোড়াতে যখন প্রশ্নটি উঠেছিল, তখন সদস্যদের মধ্যে ভয়ানক মতবৈষম্য দেখা গিয়েছিল। বিভিন্ন ও বিপরীত মতের সামঞ্জস্যবিধান এক অসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অগত্যা সাধারণ সভাতে স্থির করা হল (১৯৪৬ খ্রীঃ) যে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস, সংযুক্ত রাজ্য ও সংযুক্ত রাষ্ট্র এই আটটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যে চুয়াত্তরটি দেশের[২] সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় বার্তা সরবরাহ করতে রাজী হয়েছে, সেগুলোই স্বায়ত্তশাসন-হীন দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে। এভাবে সমস্যাটির একটা মোটামুটি নিষ্পত্তি হল।

শীগ্‌গীরই আবার এক নূতন ফ্যাসাদ বাধল। কয়েকটি রাষ্ট্র

২. তালিকা পরিশিষ্ট (খ)-তে দ্রষ্টব্য।

তাদের অধীন কোন কোন দেশের রিপোর্ট পাঠানো বন্ধ করে দিল, এই যুক্তিতে যে তারা সকলেই ইতিমধ্যে স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এগারটি দেশের রিপোর্ট এই কারণে বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পরে আরও অনেক দেশের।[৩] প্রশ্ন উঠল, এরূপ একতরফা সিদ্ধান্তের অধিকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের আছে কিনা। বার্তা কমিটিতে ভারত প্রস্তাব করল যে প্রশ্নটির মীমাংসার ভার চতুর্থ কমিটিকে দেওয়া হোক এবং আবশ্যক হলে আন্তর্জাতিক ধর্মাধিকরণের (International Court of Justice) মত নেওয়া হোক। প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেল কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে ভারত চতুর্থ কমিটিতে বিষয়টির পুনরুত্থাপন করল। কোন কারণ না দেখিয়ে সহসা রিপোর্ট পাঠানো বন্ধ করা হয়েছে দুঃখের সহিত এই কথার উল্লেখ করে, চতুর্থ কমিটি যে মত প্রকাশ করল তা এইরূপ। সত্যই যদি এই হয়ে থাকে যে দেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহলে আনন্দের কথাই বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সংবাদ ও বিবরণ পূর্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘে জানান উচিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা যেন জানানো হয়, এই অনুরোধ জ্ঞাপন করে প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল। সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করল।

রিপোর্ট বন্ধ করবার যে সব কারণ পরে দর্শান হয়েছিল, সকল ক্ষেত্রে তাদের যৌক্তিকতা স্বতঃ-প্রতীয়মান ছিল না। গিয়ানা, মার্টিনিক, নিউ ক্যালিডোনিয়া, স্যাণ্ট্ পিয়ার প্রভৃতি ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটি দেশ ফরাসী ইউনিয়নের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। এরা ইউনিয়নের অন্যান্য বিভাগেরই (Department) প্রায় সদৃশ বা সমপর্যায়ভুক্ত, ফরাসীদের পক্ষ থেকে এরূপ দাবী সত্ত্বেও এদের স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল। মাল্টা সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের

৩. একটি তালিকা পরিশিষ্ট (গ)তে দেওয়া হল।

প্রদর্শিত কারণ ছিল আরও বিতর্কমূলক। দ্বীপটিকে পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনীতিক অধিকার দিয়ে তারা ৭৩ (ঙ) উপধারার অর্থাৎ রিপোর্ট পাঠাবার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে, সংক্ষেপে এই ছিল তাদের যুক্তি বা অছিলা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রসঙ্গটির পরবর্তী আলোচনায় প্রথমে এই কথাটি জোর দিয়ে বলা হয় যে, কোন দেশের রিপোর্ট পাঠান হবে কি না হবে সে বিষয়ে মত ব্যক্ত করবার অবিসংবাদিত দায়িত্ব ও অধিকার রাষ্ট্রসংজ্ঘের আছে। পরে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও কমিটির মতামত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও আপস-মীমাংসার ফলে সাধারণ সভা স্বায়ত্ত-শাসনের লক্ষণ নির্ণয় করে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, এক পক্ষে প্রভুরাষ্ট্র ও অন্য পক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দুয়ে মিলে নির্দিষ্ট লক্ষণগুলির সাথে মিলিয়ে ধার্য করবে কোথায় কখন ৭৩ (ঙ) উপধারার প্রয়োগ অনুপযোগী ও অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। লক্ষণগুলির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অবাধ অধিকার লাভই স্বরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে নিরূপিত হয়েছে।

স্বায়ত্তশাসনের নিদর্শন কি, মোটামুটি স্থির হল বটে; কিন্তু তা নিয়ে ঝঞ্ঝাট মিটল না। ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি যে সব দেশ স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যও পেয়েছিল তাদের নিয়ে অবশ্য কোন ঝামেলা ছিল না; কিন্তু যেখানে স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির পর পূর্ব বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি, সেখানে সন্দেহ উপস্থিত হল অধীন দেশটি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে এরূপ সংযোগ রক্ষা করেছে কিনা; আর তা যদি করেও থাকে, তাতে স্বায়ত্তশাসন সীমিত হয়েছে কিনা অথবা ভবিষ্যতে বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা আছে কিনা। এসব নিয়ে বচসার আর অন্ত ছিল না।

সুরিনাম (বা ডাচ গিয়ানা) ও এ্যান্টিলিজ এই দুটিকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হয়েছে বলে হল্যাণ্ড যখন প্রথমে রাষ্ট্রসঙ্ঘে রিপোর্ট পাঠাতে ক্ষান্ত হল, তখন তা নিয়ে খুবই গোলমাল হয়েছিল।

ব্যবস্থাটি ছিল মধ্যবর্তীকালীন। চূড়ান্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রিপোর্ট যাতে বন্ধ করা না হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে এরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হল। হল্যাণ্ড এই নির্দেশ মান্য করে নি। কিন্তু তখন থেকে শাসনতন্ত্রের যখন যেরূপ রদবদল করা হয়েছিল তা রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জানাতে কসুর বা গাফিলি করে নাই। আখেরে ব্যবস্থাপনাটি চরম ও পাকা করে প্রমাণপত্র সহ রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাঠিয়ে তার সন্তোষসাধন ও অনুসৃত নীতির অনুমোদন লাভ করেছিল। পোর্টোরিকোর বেলায়ও ঠিক একই ধরনের আপত্তি হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেই দেশটি স্বাধীনতা পেয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘে আর রিপোর্ট পাঠাবার দরকার নেই ভেবে যুক্তরাষ্ট্র কাজেও তাই করেছিল। দেশটির তথাকথিত স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে না পেরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সহজে তাকে নিষ্কৃতি দিতে চায় নাই। পোর্টোরিকো পূর্ণতর স্বরাজ অথবা স্বাতন্ত্র্য চাওয়া মাত্র কাল বিলম্ব না করে দাবি পূরণ করা হবে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এই অকপট আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরস্ত হয় নাই। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের ঘোরতর প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সাধারণ সভা জোর গলায় এই কথাটাই বারবার বলেছে যে, কোন অধীন দেশ স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে কি না পেয়েছে তা ঠিক করবার অধিকার নিঃসংশয়ে তাদেরই।[৪] মতভেদ ও বিরোধ সত্ত্বেও কোন পক্ষই কিন্তু মামলাটির মীমাংসার জন্যে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের শরণাপন্ন হতে চায় নাই।

---

৪. সম্প্রতি দক্ষিণ রোডেশিয়া নিয়ে প্রশ্নটি প্রবল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সরকার ও তাদের সমর্থকদের মতে দেশটি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের ফলে স্বায়ত্তশাসনলব্ধ দেশের মধ্যে গণ্য। কিন্তু ১৯।৬।৬২ তারিখের গৃহীত প্রস্তাবে সাধারণ সভা তাদের মত অগ্রাহ্য করে দেশটিকে স্বায়ত্তশাসনহীন দেশ বলে সাব্যস্ত করেছে। বিরোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা যায় না। কিন্তু বিটিশ গভর্নমেণ্ট দেশটির বার্ষিক রিপোর্ট পাঠাতে রাজী হবে বলে মনে হয় না।

পর্তুগাল ইউ-এন্-ওর সদস্যভুক্ত হওয়ার পর সমস্যাটি নূতন আকার ধারণ করল। পর্তুগাল তার অধিকৃত দেশগুলির রিপোর্ট পাঠাতে সেরেফ অস্বীকার করে বসল। তার ওজরটি ছিল বেশ হাস্যকর। এশিয়াতে ও আফ্রিকাতে যেখানে যেখানে তার যত অধীন দেশ আছে সবই নাকি তার রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বারবার তলব করেও যখন তার কাছ থেকে ৭৩ (ঙ) উপধারা অনুযায়ী রিপোর্ট আদায় করা সম্ভবপর হল না, তখন অধীন দেশের সংজ্ঞা নির্ধারণের যে প্রশ্নটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ এতদিন এড়িয়ে চলছিল, সেইটেই তার সামনে জরুরী হয়ে উঠল।

উপনিবেশগুলিতে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেমন, তত্রত্য অধিবাসীদের সহিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনেও তেমনি ঔপনিবেশিকতা বিরুদ্ধ রাষ্ট্রগুলি অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিল। তাদের চেষ্টায় সাধারণ সভার ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশনে নিম্নলিখিত রূপ দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবটি এই যে, বার্তা-প্রেরণ কমিটিতে সহযোগী সদস্য রূপে উপনিবেশদের আসন দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হোক। দ্বিতীয় প্রস্তাবে এরূপ অভিলাষ ব্যক্ত করা হয় যে, অধীন দেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যে সকল প্রস্তাব পাস করা হয় তাদের মধ্যে যেগুলো যে এলাকার বিষয় সেগুলো সেখানকার স্থানীয় ব্যবস্থাপক ও নির্বাহক কর্তৃপক্ষের (Local Legislative and Executive Authority) গোচরীভূত করবার জন্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের তরফ থেকে সমুচিত ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম সঙ্কল্পটি বৃথাই হয়েছিল। ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধাচরণে বার্তা কমিটিতে উপনিবেশগুলিকে সহযোগী সদস্য পদভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। অগত্যা কমিটির প্রতিনিধিত্বে যাতে অন্ততঃ দেশীয় লোকদেরও নির্বাচন করা হয়, তার জন্যে চেষ্টা চলেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদের অনুরোধ জানান হয়েছিল এবং বার্তাকমিটিকেও

অবহিত হবার জন্য অনুজ্ঞা করা হয়েছিল। তার পর থেকে প্রতিনিধি পদে দেশীয় লোকেদের নিয়োগ অল্পবিস্তর হয়ে এসেছে। কোন ঔপনিবেশিকই অনুরোধটি একেবারে অবহেলা করে নাই।

উপনিবেশ সংক্রান্ত কাজের যত সব ঝুঁকি ও ঝামেলা রাষ্ট্রসঙ্ঘের কমিটিগুলির মধ্যে প্রধানতঃ বার্তা ও চতুর্থ কমিটি দুটিকেই পোহাতে হয়। কিন্তু অন্যান্য কমিটিগুলি একেবারে দায়মুক্ত বা নিষ্ক্রিয় নয়। টেকনিক্যাল সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কার্যসূচি (International Technical Assistance Programme) রচনায় দ্বিতীয় অর্থাৎ আর্থিক কমিটি (Economic and Finance Commitee) অধীন দেশের কথা কখনও ভুলে নাই। ঔপনিবেশিকদের বিষম প্রতিকূলতার মধ্যেও তৃতীয় ওরফে সমাজ, মানবতা, ও কৃষ্টি কমিটি (Social, Humanitarian & Cultural Commitee) অধীন জাতিদের স্ব স্ব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয় তার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট হয়েছে। মরক্কোর স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল প্রথম বা রাজনীতিক কমিটি (Political Commitee) তাতে নির্লিপ্ত থাকে নি। নিজ নিজ জিম্মার ভিতর যার যেটুকু কাজ প্রতিটি কমিটিই তা সাধ্যমত নির্বাহ করেছে। পরিশেষে সব কিছুরই দায়িত্ব অবশ্য সাধারণ সভার, এ কথার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কমিটি ও সাধারণ সভার কাজে সাহায্য করবার জন্য রয়েছে মহাকরণ। তথ্য সংগ্রহ, তাদের বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপন, স্মারকলিপি ও সন্দর্ভ রচনা ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে আলোচনার খোরাক যোগান ও ক্ষেত্র তৈরি করাই তাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

অধিকন্তু, ইউ-এন-ওর প্রায় সকল বিভাগকেই (Department) তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে সময়ে সময়ে ঔপনিবেশিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং তৎসংক্রান্ত কর্তব্য পালন করতে হয়। ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহ সময়ে বিবিধ সমস্যার নিরসনে নিরাপত্তা

পরিষদের সক্রিয় সহায়তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। বিশেষতঃ আর্থিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), মানব অধিকার কমিশন (Human Rights Commission) ইত্যাদি এরূপ কতিপয় বিভাগ বা উপবিভাগ আছে, যাদের প্রায় সকল কাজই স্বাধীন ও অধীন উভয় শ্রেণীর দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট।

অধীন দেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশিষ্ট নিযুক্তক সংস্থাগুলির (Specialised Agency) ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর নয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত পরাধীন দেশগুলি সহযোগী সদস্যরূপে তাদের সহিত সংযুক্ত হয়েছে। FAO, ILO, WHO, UNESCO ইত্যাদি অনেকেরই প্রতিনিধি বার্তাকমিটি ও তার উপকমিটির আলোচনায় নিয়মিতভাবে যোগদান করে থাকে। অধীন দেশে টেকনিক্যাল সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থাও তাদের মাধ্যমে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করছে।

এমনি করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্তরে স্তরে এবং শাখাপ্রশাখায় অধীন দেশের সমস্যা ও কর্তব্য নিয়ে জড়িয়ে আছে। কিন্তু নানা খাতে তার যে কর্মপ্রবাহ চলেছে, তাদের সংযোগ বা সঙ্গতি রক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন স্থান থেকে সমস্ত কাগজপত্র এসে যখন মহাকরণের দপ্তরে জমা হয়, তখন সেখানে খানিকটা সমন্বয় সাধিত হয়ে থাকে, আর যতটা সম্ভব সাধারণ সভার বৈঠকেই সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলে।

একাদশ অধ্যায়ের যে কোন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ সভাতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হত। অথচ সনদের ১৮ ধারা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই শুধু এই নিয়ম প্রযুজ্য। যাহোক সভার অষ্টম অধিবেশনে এই দুর্বোধ্য রীতিটির পরিবর্তন করে যথাস্থলে সুদ্ধমাত্র ভোটাধিক্যে সঙ্কল্প গ্রহণের নিয়মও প্রবর্তন করা হল। ঔপনিবেশিকেরা এতদিনে তাদের বড় একটি রক্ষা-কবচ হারাল।

প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি রাষ্ট্রসঙ্ঘের খতিয়ান ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে, অস্বীকার করবার জো থাকে না যে অধীন জাতির স্বার্থ সংরক্ষণে ও তাদের অবস্থার যথোচিত উন্নয়নে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি আশানুরূপ সফলকাম হতে পারে নি। সদস্যদের মধ্যে ঔপনিবেশিকদের প্রতিপক্ষগণের সংখ্যা কম ছিল না, তাদের চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু ঔপনিবেশিকদের এঁটে উঠতে তারা পারে নি। কোন প্রস্তাব মনঃপূত না হলে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি তখনই সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে, অসহযোগিতার ভয় প্রদর্শন করেছে, নানা ভাবে বাধা দিয়েছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বেলজিয়াম ত বার্তা-কমিটিকে বর্জনই করেছে। ঔপনিবেশিকদের হুমকিতে অন্যদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুর নামাতে হয়েছে। কেননা তাদের সহযোগিতা ছাড়া এগার পরিচ্ছেদের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে কোন কিছু করবার পথও ছিল না। অধীন দেশগুলি সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা সচরাচর বিনা প্রত্যবায়ে সেগুলো উপেক্ষা করে এসেছে। এমন কি সাধারণ সভাতে যে সকল প্রস্তাব ও সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তাদেরও বড় পরোয়া করে নাই। এমনতর অবস্থায় ঔপনিবেশিক প্রশাসনে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থ ও মঙ্গলই যে সর্বাগ্রগণ্য, সনন্দপত্রের এই মর্মবাণীটির মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে নি। গত চোদ্দ-পনর বৎসরের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরাধীন দেশের প্রত্যক্ষ উপকারসাধনে একাদশ অধ্যায়টির অনুপযোগিতা ও অকার্যকারিতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়েছে, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের দৃঢ়তার ফলেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি আপনাদের মর্জিমত স্বীয় পরিচালনাধীন দেশের রিপোর্ট পাঠান বন্ধ করতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘই উপনিবেশগুলির প্রকৃত অবস্থা

জগতের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করে বিপথগামী ঔপনিবেশিকদের পথের কণ্টকস্বরূপ হয়েছে; জনমতকে জাগ্রত করে সতর্ক প্রহরীর কাজে লাগিয়েছে। ফলে শাসকসম্প্রদায় সাবধান হয়ে অতীতের অন্যায়-অনাচার-অবিচার দূরীকরণে অধিকতর মনোনিবেশ করেছে এবং উপস্থিত দুরভিসন্ধি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর উপনিবেশগুলির নানাবিধ সমস্যার অনুশীলনে ও গবেষণায় উৎসাহ দিয়ে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় টেকনিক্যাল সাহায্যের বন্দোবস্ত করেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাদের কম উপকার করে নাই। বস্তুতঃ পরোক্ষভাবে যে কত দিক দিয়ে অধীন দেশগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রভাব, প্রতিপত্তি, অনুকম্পা, ও উদ্যমের ফলে প্রভূত উপকৃত হয়েছে তার ঠিক ইয়ত্তা করা যায় না।

ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের অত্যাবশ্যকতার বিষয় পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এখানেও পুনরুক্তি করতে হচ্ছে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ও যুক্তরাজ্য এযাবৎ তাদের অধীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার রিপোর্ট দিতে স্বীকৃত হয় নাই। তাদের এরূপ জিদ যে অন্যায় ও নিন্দনীয়, সহজেই তা প্রতিপন্ন হবে। যে কোন দেশই ধরা যাক না কেন, তার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় না জেনে তার শিক্ষারীতি, সমাজনীতি, ও বিষয় ব্যবসার আলোচনা অবাস্তব না হয়েই পারে না। সুতরাং দেশ তিনটির উচিত সামান্য ইজ্জতের প্রশ্নে যা যুক্তিযুক্ত তাতে বিঘ্ন উৎপাদন না করা। দ্বিতীয়তঃ, বার্তা-কমিটির স্থায়িত্বের প্রতিবন্ধকতা করে ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিচ্ছে। কমিটির প্রয়োজনীয়তা তারা অস্বীকার করতে পারছে না, বছরের পর বছর তার অস্তিত্বকে মেনে নিতেও বাধ্য হচ্ছে, অথচ কেবলমাত্র legalistic ছুতা ধরেই এ যাবৎ কাল সংস্থাটিকে কায়েম হতে দিচ্ছে না। যত সত্বর তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে ততই তাদের নিজেদেরও মঙ্গল। তৃতীয়তঃ, আরও নিয়মিত

ভাবে এবং বেশী সংখ্যায় উপনিবেশের খাঁটি অধিবাসীদের বার্তা-কমিটি, অছি-পরিষদ প্রভৃতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিবিধ সংস্থায় প্রতিনিধি-রূপে নিয়োগ করা তাদের কর্তব্য। তাতে অকারণ সন্দেহবশতঃ যেসব বিরুদ্ধ ও অপ্রীতিকর সমালোচনা তাদের সহ্য করতে হয়, তার হাত থেকে তারা অনেকটা রেহাই পাবে। পরিশেষে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের হানি বা গৌরব লাঘবের আশঙ্কায়, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে উপনিবেশগুলি পরিদর্শন করতে দিতে বরাবর যে আপত্তি তারা তুলেছে, তাও বৃহত্তর আদর্শের অনুগামী হয়ে পরিহার করা উচিত। ছুনিয়ার থেকে আলাদা করে কোন দেশকেই কেবল নিজের নজরবন্দী করে রাখবার দিন আর নেই, এই প্রচণ্ড সত্যটিকে উপলব্ধি না করে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার অধীন দেশকে আড়ালে ঢাকতে চেষ্টা করবে সে শুধু তাতে নিজের মঙ্গলই ঢাকবে।

পক্ষান্তরে, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী দলেরও এমন আচরণ করা সঙ্গত নয় যাতে ঔপনিবেশিকেরা ভড়কে যায়। শুধু গায়ের ঝাল মিটাবার জন্যে কটূক্তি বর্ষণ করার কিংবা অযথা হৈচৈ করার প্রলোভন সম্বরণ করে সর্বদা গঠনমূলক মনোভাব অবলম্বন করে চলাই তাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। অন্যথা ঔপনিবেশিকদের মনে অহেতুকী ভীতি উৎপাদন করে তাদের আরও পিছপাও করে দেওয়া হবে। কোন ধারার বা উপধারার অর্থ নিয়ে মতের গরমিল হলে বা কোনরূপ সন্দেহের কারণ ঘটলে, আইনের মারপ্যাঁচ না কষে বা খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়াঝাটি না করে, আন্তর্জাতিক আদালতের রায় নেওয়া ও মানা উভয় পক্ষেরই উচিত।

একাদশ অধ্যায়টিই দাসজাতির বিশেষ অধিকার-পত্র, পূর্বেই বলেছি। ঔপনিবেশিক ও তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মত ও পথের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের দ্বারা একদিকে যেমন অধিকার-পত্রটি সার্থক-নামা করে তুলতে হবে, অপরদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অধ্যায়টির নাম করে বা দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য বিভাগে

অধীন দেশ সম্পর্কিত যথাবিহিত কাজগুলো বাদ না পড়ে এবং সঙ্কল্প ও প্রস্তাব গ্রহণের সময় স্বাধীন ও অধীন উভয় প্রকার দেশের উপরই সমভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। যা কাম্য তা সত্যই সাধিত হবে কিনা অসংশয়মনে বলা কঠিন। একাদশ অধ্যায়ের দীপটি হাতে তুলে ধরে 'কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার' দূর করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অধীন দেশগুলিকে মুক্ত অঙ্গনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, না যে 'বর্তিকাধারী' 'আপনি আপন পথ দেখিতে না পায়' তারই সঙ্গে তুলনীয় হবে, কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ তার সদুত্তর দিতে পারে। যা দেখা যাচ্ছে তাতে এই অনুমান অন্ততঃ অসঙ্গত হবে না যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতর যে উল্টো হাওয়া বইছে তাতে 'বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি' যতই উড়ুক দীপনির্বাণের কিংবা দীপশিখা বিপরীতমুখী হবার কোন আশঙ্কা নেই। 'পুলকে নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে জ্বলে সে ইঙ্গিত'।

৯

উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কি আয়তনে, কি লোক-সংখ্যায় পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশে বিদেশী শাসন কায়েম ছিল। উপনিবেশ (colony), আশ্রিত রাজ্য (protectorate), রক্ষণাধীন দেশ (mandate) প্রভৃতি নানাবিধ পরাধীন দেশের সংখ্যা ছিল আশিরও উপরে। তাদের মধ্যে যেমন এক প্রান্তে ছিল 'ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠ-নিনাদিত' ভারতের মত জনবহুল বিশাল দেশ তেমনি অপর প্রান্তে ছিল মাত্র তিন হাজার লোকের বাসভূমি নারুর মত ক্ষুদ্র দ্বীপ। সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক দিয়েও তাদের তারতম্য ছিল বিস্তর। স্যামোয়া, প্যাপুয়া, নিউগিনি ইত্যাদির মত আদিম বর্বর জাতি-অধ্যুষিত অনুন্নত দেশ থেকে আরম্ভ করে মিশর, ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য, সব স্তরের দেশ এই অধীন দেশের তালিকাটিতে ছিল। আবার এদের মধ্যে কোথাও ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও আর্থিক সচ্ছলতা, কোথাও বা নৈসর্গিক রিক্ততা ও অপরিমেয় দারিদ্র্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিরতির প্রাক্কালে ২৩০ কোটি নরনারীর মধ্যে ৮৫ কোটিই ছিল পরাধীন। তাদের অধিকাংশই ছিল গ্রেট ব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ইটালি এবং স্পেন এই কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বশ্যতায়। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের অধীনে ছিল যথাক্রমে ১½ ও ৬ কোটি লোক। তারপর দশ বৎসরের মধ্যে ৬০ কোটির মত লোক স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর যে সকল দেশ একে একে শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছিল

তাদের একটি সারণি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।[১] দেখা যাবে যে এতে আফ্রিকা মহাদেশের মাত্র চারটি দেশের নাম আছে ; যথা লিবিয়া, মরক্কো, সুদান, ও টিউনিশিয়া। মিশর, ইথিওপিয়া, এবং লাইবিরিয়া অবশ্য পূর্বেই স্বাধীন হয়েছিল। বাকী অংশে তখনও ২০ কোটিরও বেশী আফ্রিকাবাসী পরপদানত।

ক্রমে ক্রমে গোল্ডকোস্ট (ঘানা), গিনি প্রভৃতি আফ্রিকার আরও দেশ বৈদেশিক শাসন হতে মুক্ত হল এবং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দশটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। অন্যদিকে মালয়ার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে এশিয়াতে বিলুপ্তপ্রায় ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ আর একটি চিহ্ন মুছে গেল। এতগুলি দেশের এত সত্বর ও সহজে মুক্তিলাভ অভিনব ও বিস্ময়কর। এই অভাবনীয় পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালটিকে জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

বিশেষ করে স্মরণীয় ১৯৬০ সালটি। এই বৎসরটিতে ব্রিটিশের অধীনস্থ ও ইটালির হস্তে গচ্ছিত সোমালিল্যাণ্ডের ছিন্ন অংশ দুটি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জিম্মায় ন্যস্ত টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুন এবং উক্ত রাষ্ট্রদুটির অধিকারে দ্বিখণ্ডিত নাইজিরিয়া, ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ফরাসী নৈরক্ষিক আফ্রিকা এবং আরও কত দেশ দীর্ঘকালের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে নবজন্ম লাভ করল। বর্ষশেষে তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল আঠারটি। ফলে ৮ কোটি ২০ লক্ষ লোক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ইউরোপের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও বৎসরটি স্বুবর্ণ-অক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিলীয়মান সাম্রাজ্যবাদের উপান্ত্য ধ্বজাটি সাইপ্রাসে অবনমিত হওয়ার ফলে মহাদেশটির মানচিত্রে দাসত্বের কালিমা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু মাল্টায় তার শেষ রেখাটুকু ফিকে হয়েও সম্পূর্ণ

---

১. পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য।

বিলীন হয় নি। মাল্টার মুক্তিও আসন্ন এবং সময়সাপেক্ষ মাত্র।[২]

স্বাধীনতার রথ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে সূর্যকরোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। পথ বহুস্থলেই কঠিন ও কণ্টকিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় অহিংস আবহাওয়ার মধ্যেই মুখ্যতঃ চলেছে তার বিজয়-অভিযান। ইতিমধ্যে ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আরও তিনটি দেশ—ট্যাঙ্গানিকা, পশ্চিম স্যামোয়া এবং রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি—যে অভীষ্ট পরিণতি লাভ করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ করেছি। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি ব্রিটেন স্বেচ্ছায় জামাইকা, ট্রিনিডাড ও টোবাগো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এই তিনটি দ্বীপকে, এবং তার কিছুকাল পরে আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত ইউগাণ্ডাকে মুক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্রের নিঃশেষ অধিকার দান করেছে; অধিকন্তু গিয়ানা ও গাম্বিয়াকে ১৯৬২ সালের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন এবং কেনিয়াকে ১৯৬৩ সালের মধ্যভাগে পূর্ণ স্বরাজ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ডাচ নিউ-গিনির (পশ্চিম ইরিয়ান) জটিল সমস্যাটিও নেদারল্যাণ্ডস ও ইন্দো-নেশিয়ার সশস্ত্র বিরোধের সূত্রপাতমাত্রই ইউ-এন-ওর প্রচেষ্টায় সুচারুভাবে মীমাংসিত হয়েছে। স্থানটি আপাততঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রশাসনে ন্যস্ত হয়েছে এবং যথাসময়ে জনসাধারণের মত নিয়ে স্থির হবে দেশটি স্বাধীন হয়ে স্বতন্ত্র থাকবে কি ইন্দোনেশিয়ার অঙ্গীভূত হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলজিরিয়ার স্বাধীনতা অর্জন। এতকাল পরে তার বহুদিন-বঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত আশা পূর্ণ হয়েছে (৩রা জুলাই, ১৯৬৩), কিন্তু কি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়েই না তার স্বাধীনতা এসেছে!

২. বইটি প্রেসে পাঠাবার পর ৭।১২।৬২র খবরের কাগজে চোখে পড়ল যে মাল্টা কবে নাগাদ পুরোপুরি স্বাধীন হবে তা ঠিক করবার জন্যে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মাল্টার প্রধান মন্ত্রী ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রমণ্ডল সম্পর্কিত মন্ত্রী, দুজনের মধ্যে কথাবার্তা সুরু হয়েছে।

সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিকতাবাদ ধ্বংসোন্মুখ সত্য, কিন্তু আজও সম্পূর্ণ নির্মূল হয় নাই। এখনও দুনিয়ার নানা জায়গায় ৮।৯কোটির মত লোক পরবশ্যতায় কালযাপন করছে। উপরন্তু চীনের সাম্প্রতিক তিব্বতগ্রাস এক কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতি ও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তিব্বতে তার দুরভিসন্ধি প্রকট হতে না হতেই সুরু হয়েছে আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তার হামলা, যার ফলে আমাদের ১২০০০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি বেদখলী হয়েছে। একে শুধু সীমানার লড়ালড়ি মনে করলে বিষয়টিকে অত্যন্ত হালকা করে দেখা হবে। আরবদেশের গল্পে উট যেমন ঘরে ঢুকবার মতলবে প্রথমে তার নাকটাই শুধু গলাবার চেষ্টা করেছিল, দেখা গেছে যে সাম্রাজ্যবাদীরাও তেমনি চিরকালই গোড়াতে সামান্য ছুতানাতা ধরে এগিয়ে এসে পরে ক্রমশঃ সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে। চীনাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ভাববার কিই বা কারণ থাকতে পারে? আমার ত মনে হয় ইতিহাসের নাট্যশালার যবনিকার আড়ালে কপট কূটনীতির সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত চীনের সাম্রাজ্যগৃধ্নু উলঙ্গ মূর্তিটি দৃষ্টিহীন ব্যতীত আর সবারই লক্ষ্যগোচর হবে। গ্রাম্য কথায় বলতে হয় শাক দিয়ে মাছ ঢাকা পড়ছে না। তবু প্রশ্ন এই, সাম্রাজ্যলোভের কারণটি কি? জাতীয় স্বার্থান্বেষণ ও অহমিকা, না কমিউনিজমের বিজিগীষা? বলা শক্ত; কিন্তু মতলব যাই হোক না কেন, দুয়ের মধ্যে একই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ যখন অস্তোন্মুখ তখন দিগন্তে কাল মেঘখণ্ডের মত নয়া সাম্রাজ্যবাদের এই আকস্মিক আবির্ভাব সুদূরব্যাপী তুমুল ঝড় উঠবারই কি অশুভ পূর্ব লক্ষণ?[৩]

যে সব দেশ অদ্যাপি পরাধীনতার পাশমুক্ত হয় নি, তাদের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির কথা প্রথমে ধরা যাক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের

---

৩. উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব উভয় সীমান্তে যুগপৎ প্রবল আক্রমণ ও অগ্রগতি, বহু স্থান অধিকার, তৎপর স্বেচ্ছায় যুদ্ধবিরতি ও পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি সাম্প্রতিক ঘটনা বই লেখা শেষ হবার অনেক পরে ঘটেছে।

চাপে দ্বীপগুলিতে সামরিক শাসনের স্থলে সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা (civil administration) প্রবর্তন ও ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসনের বীজ বপন করতে যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াও নিউগিনিতে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। দেখেশুনে আশার সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি অদূর ভবিষ্যতে এদের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা বিরল। প্রথমতঃ, স্থানীয় অধিবাসীরা এখনও অপরিণত। দ্বিতীয়তঃ, যাদের জিম্মায় তাদের রাখা হয়েছে, তারা তাদের পূর্ণ স্বাধীনতাদানের বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া উভয়েরই আশঙ্কা যে জায়গাগুলি একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেলে, তাদের নিজেদের এবং সংলগ্ন ও সন্নিহিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে।

জাতিসঙ্ঘের রক্ষণাধীন যে দেশগুলি ইতিপূর্বে স্বাধীনতা লাভ করে নি, একমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া আর সবই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হেফাজতে এসেছে, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তা বলেছি। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতেও আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বড় কম হয় নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এলাকানামাতে দেশটি পরিচালনা করবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাধারণ সভা বারবার অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা তার দিকে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করে স্বৈরাচারী শাসন, বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত দুর্নীতি ও জুলুম (Apartheid) পূরাদমে সেখানে চালিয়েছে।

আফ্রিকার অন্যান্য অবশিষ্ট পরাধীন দেশগুলিতে সর্বত্র না হলেও বহু ক্ষেত্রে মুক্তি-আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা তাদের অনেকের পক্ষে সহজলভ্য না হবারই আশঙ্কা, কিন্তু কালের প্রভাবে তা অবশ্যম্ভাবী। ঘটনাস্রোত সেদিকেই প্রবহমান। অধুনা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জাঞ্জিবার, রোডেশিয়া, ও নিয়াসাল্যাণ্ডের সমস্যার সমাধানে বিশেষ সচেষ্ট। সম্যক্ সফল না হলেও চেষ্টা ক্রমশঃ কার্যকরী হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে আগামী বৎসরের মধ্যে এদের সবাইর

একটা সুরাহা হবে।[৪] দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বহু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গদের বাস এবং বর্তমানে তাদেরই বিষম প্রতাপ ও আধিপত্য। তাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে দক্ষিণ রোডেশিয়ার আফ্রিকানদের স্বরাজলাভ কিয়ৎকাল বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু খুব বেশীদিন তাদের রোধ করা যাবে না।[৫]

সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে, স্পেন ও পর্তুগালের সাম্রাজ্য নিয়ে। স্পেনের অধীনে এখনও ১১৭,০৮৪ বর্গমাইল ভূমি এবং

৪. বই লেখা শেষ হবার পর ইতিমধ্যে নিয়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়া সম্পর্কে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা খুবই আশাপ্রদ।

১৯।১২।৬২ তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপপ্রধান মন্ত্রী মিঃ বাটলারের বিবৃতিতে শ্বেতজাতির কতৃত্বাধীন মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন থেকে নিয়াসাল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অনতিকাল পরেই (১লা ফেব্রুআরি, ১৯৬৩) দেশটিকে আভ্যন্তর স্বায়ত্তশাসনও দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই পূর্ণ স্বরাজ লাভ তার সুনিশ্চিত।

অনেক গড়িমসির পর খুব সম্প্রতি (২৯শে মার্চ, ১৯৬৩) উত্তর রোডেশিয়ার দাবিটিও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মেনে নিয়েছে—ফেডারেশনের বেষ্টনীর মধ্য থেকে নিষ্ক্রমণের আর কোন বাধা তার নাই। এ যে শুধু দেশটিকে স্বরাজ দেবারই পূর্বাভাষ মাত্র, যেমন দেখা গিয়াছে নিয়াসাল্যাণ্ডের বেলায়, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে।

ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর ৯।৪।৬৩ তারিখের ঘোষণাতে প্রকাশ যে জাঞ্জিবার আগামী জুন মাসে আভ্যন্তরিক স্বায়ত্তশাসন পাবে এবং আভ্যন্তরিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ণ স্বাধীনতালাভেরই প্রস্তুতি।

৫. ফেডারেশন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রমে দক্ষিণ রোডেশিয়াতেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য বিষম সোরগোল সুরু হয়েছে। বর্তমান শাসনতন্ত্রে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বার্থ সুরক্ষিত নয়। যথোচিত গণতান্ত্রিক সংস্কার ব্যতীত দেশটিকে সরাসরি স্বাধীনতাদানের অর্থ, মানুষের অধিকারে বঞ্চিত ত্রিশ লক্ষ আফ্রিকানদের ভাগ্য আড়াই লক্ষ স্বার্থোদ্ধত ইউরোপীয়ের হাতে তুলে দেওয়া অর্থাৎ বাঘের গরু-রাখালি গোছের ব্যবস্থা করা। ফলে আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকারই সৃষ্টি হবে, এরূপ আশঙ্কা অহেতুক নয়।

সমস্যাটি নিয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের বিরোধ ক্রমশঃ সঙ্গিন হয়ে উঠছে। সমাধানের বিলম্বে অনর্থ ত কেবল বাড়বেই, এমন কি আলজিরিয়াতে যেমন হয়েছিল তেমনি শোচনীয় বিপর্যয় ঘটাও অসম্ভব নয়। বিষয়টির সুমীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘও উদগ্রীব এবং উদ্যোগশীল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচিত আবশ্যক মত রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করে অবিলম্বে যথাকর্তব্য পালন করা।

৪০৬,০০০ লোক[৬] ; সবই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলভাগে, ইফনি, মরক্কো, সাহারা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে বিভক্ত ও পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। স্পেন সাম্রাজ্যের মধ্যে উপস্থিত কেবলমাত্র রি-ও-মুনিতে সবেমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, কিন্তু অন্যত্র জাগরণের সাড়া বা আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। বিভ্রান্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল স্পেন তার প্রাক্তন বিশাল সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাবশেষটুকু প্রাণপণে আঁকড়ে আছে।

পৃথিবীতে আজ ক্ষুদ্র পর্তুগালেরই বৃহত্তম সাম্রাজ্য ; আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে এজোরস, ম্যাডিরা, কেপভার্ড প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে, ভারত মহাসাগরে অবস্থিত টিমরের উত্তর-পূর্বাংশে, চীনে মাকাও, আফ্রিকায় এঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি স্থানে ৮ লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী জায়গা নিয়ে প্রসারিত। প্রায় ৮০ লক্ষ লোক তার পদতলে নিষ্পেষিত হচ্ছে।[৭] আজ তার হঠকারিতা শিখরসীমায় উঠেছে। আপসে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তে তার গভর্নমেণ্ট রাজী নয়। সম্প্রতি এঙ্গোলায়, মোজাম্বিকে ও গিনিতে গণবিদ্রোহ দমনে অমানুষিক বর্বরতার পরিচয় দিতে পর্তুগীজ শাসকেরা এতটুকু লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বসম্মত নির্দেশ বা অনুরোধ তারা গ্রাহ্য করছে না এবং তার মধ্যস্থতা গ্রহণেও তাদের ঘোরতর আপত্তি। এই সেদিনও পর্তুগালের সর্বাধিপতি স্যালাজার স্পষ্ট ভাষায় দুনিয়ার সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অধীন কোন দেশেরই কোনকালে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না।[৮] আশার কথা এই যে তাঁর নিজের দেশের অভ্যন্তরেই

৬. গণনায় ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জকে স্পেনের অঙ্গ হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৭. এজোরস ও আরও দুই একটি স্থান গণনাভুক্ত করা হয় নি।

৮. লিসবন হতে ৫।৫।৬২ তারিখের প্রেরিত সংবাদটি Statesman হতে নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

The Portuguese Premier has clearly stated that there is no possibility of independence for Angola and Mozambique either "in the short or long run" says A F P.

প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী দল ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই দুর্দমনীয় হয়ে উঠবে এই উপচীয়মান শক্তি 'বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি পরিপূর্ণ বলে'।

উপরের বিবরণ থেকে বেশ বুঝা যাচ্ছে যে পরাধীন দেশের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে বলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বোঝার ভার যতটা লঘু হবার কথা ততটা হয় নি। বাকী দেশগুলিকে মুক্ত করবার ব্যাপারে বরং তাকে আরও বেশী বেগ পেতে হবে এবং বিশেষভাবে সজাগ ও তৎপর হতে হবে। তাদের মুক্তির জন্য আফ্রিকার ও এশিয়ার সদ্য-স্বাধীনতা-লব্ধ দেশগুলি এবং রাশিয়া প্রমুখ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি অপরিসীম আগ্রহ প্রকাশ করছে। বিশ্বের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থনও তাদের পেছনে আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তায় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা নানাভাবে সচেষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য যা দুর্নিবার তাকে খামকা ঠেকাতে চেষ্টা না করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে মেনে নেওয়া। তাদের প্রতিপক্ষদের বর্তমান অসংযম ও অসহিষ্ণুতা তাতে নিশ্চয়ই উপশমিত হবে। নতুবা শুধু যে অবাঞ্ছিত তিক্ততার সৃষ্টি হবে এমন নয়, অধিকন্তু বর্ণবিদ্বেষের বিষবৃক্ষ আরও দৃঢ় ও বিস্তৃত হবে।

দুঃখের বিষয় পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সমস্যাটি বৃহত্তর রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই আজ রাষ্ট্রাদর্শের বৈষম্যের ভিত্তিতে যথাক্রমে মার্কিনের ও সোভিয়েটের নেতৃত্বাধীনে দুটি দলে বিভক্ত। দলাদলিতে একদিকে যেমন স্বাধীনতা-সংগ্রাম অবস্থাবিশেষে জোরদার হয়েছে, তেমনি আবার অন্যদিকে

"The African territories could only develop harmoniously within the Portuguese nation" and Portugal could not consider "the dismemberment of the country", he stated in a recent interview, according to the Portuguese National Information Secretariat (SNI)."

কখনও কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুদলের টানাহেঁচড়াতে ইন্দোচীন ও কোরিয়ার স্বাধীনতা যে কিরূপ বিপরিণত হয়েছে তা সকলেরই সুবিদিত। স্বাধীনোত্তর কঙ্গোতে যে তাণ্ডব ঘটেছিল, তারও মুখ্য না হলেও অন্যতম কারণ ছিল দল দুটির উস্কানি। এরূপ পরিস্থিতিতে পরাধীন দেশ সম্পর্কে ইউ-এন-এর দায়িত্ব জটিলতর হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতার সমস্যা সকল পরাধীন দেশে এক প্রকার নয়। সমস্যা সমাধানেরও কোন বাঁধাধরা রীতি নেই। অবস্থাভেদে ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসা হওয়াই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কাঙ্ক্ষনীয়। প্রশ্ন উঠবে, যেখানে পর্তুগালের মত আত্মসংভাবিত স্পর্ধিত সাম্রাজ্যবাদী স্বাধীনতার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে রেখেছে, সেখানে কঃ পন্থাঃ। গত্যন্তর না দেখে ভারতকে ত বলপ্রয়োগেই গোয়া, দমন ও দিউ-এর উদ্ধার সাধন করতে হল। ইউ-এন-এতে তার কাজের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু যারা নিন্দাবাদ করেছে, তারা নিজেরাই অনেকে দোষদুষ্ট। আশ্চর্যের বিষয় যে দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর কাল ভারত যখন আপসে নিষ্পত্তির জন্য বৃথাই মাথা খুঁড়েছে, আজকের শান্তি-দূতেরা তখন টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে নি। ইউ-এন-এর তরফে সালিসির বা অন্য কোন ফিকিরে মামলাটির ফয়সালার কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নি। পর্তুগালের অযৌক্তিক ও অনমনীয় মনোভাবের সম্বন্ধে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য হয় নি। অধিকন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি ও নির্দেশ পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও, তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করা হয় নাই। এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত করে ইউ-এন-এর মধ্যেই তাকে নানাভাবে পরোক্ষ প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। অথচ পরাধীন দেশের মুক্তি-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সবচেয়ে বড় বলভরসাই হচ্ছে ইউ-এন। বিশ্বসংস্থাটি যতদিন ক্ষমতার রাজনীতির (power politics) ঊর্ধ্বে না উঠতে পারবে, ততদিন সত্যিকারের কাজের ঠিক উপযুক্ত হবে না।

ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষুব্ধ ভাব রাষ্ট্রসঙ্ঘের চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তাকে রূপায়িত করবার জন্যে ভারতের প্রতিনিধিকে সভাপতি নির্বাচন করে সতর জন সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি সম্প্রতি (১৯৬১ খ্রীঃ) গঠিত হয়েছে।[৯] কমিটি বিভিন্ন উপকমিটির সাহায্যে তাদের নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করেছে। পর্তুগাল সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক চিঠিপত্র লিখেও কোন সন্তোষজনক উত্তর আদায় করা যাচ্ছে না। যাহোক কমিটি তত্রাপি অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং শুনা যাচ্ছে সাধারণ সভার আগামী সাধারণ অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করবে। আমরা দেখেছি যে পরাধীন দেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু সকল সময়ে ঠিক পথ ধরে চলতে পারছে না। আশা করা যেতে পারে যে কমিটির রিপোর্টটি ভবিষ্যৎ দিঙনির্ণয়ে ও পথপ্রদর্শনে বিশেষ কার্যকরী হবে।

জাতিসঙ্ঘের সহিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র না থাকাতে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার পরিচালনায় দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছি হতে আইনতঃ বাধ্য নয়। কিন্তু আনুপূর্বের অভাবে দেশটির পূর্বার্জিত আন্তর্জাতিক সত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে না এবং ন্যাসপালরূপে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব দায়িত্বেরও কোন ব্যতিক্রম বা লাঘব হতে পারে না। সুতরাং দায়িত্ব যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, তার তত্ত্বাবধানের অধিকার আন্তর্জাতিকতা যেখানে মূর্ত হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘেই নিঃসন্দেহে বর্তেছে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে এরূপ অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে কোনপ্রকার তদন্ত বা তদারক করবার সুযোগ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে দিতে দক্ষিণ আফ্রিকা কিছুতেই সম্মত হচ্ছে না। অনেক পীড়াপীড়ি করেও তার কাছ থেকে কোন বৎসরই পাওনা রিপোর্ট উসুল

৯. সদস্যের সংখ্যা বেড়ে পরে ২৪ জন হয়েছে।

করতে পারা যাচ্ছে না। দেশটির তদবিরের যা-হোক-একটা বন্দোবস্ত অবশ্য চালু করা হয়েছে এবং লোকেদের দরখাস্ত নেওয়া নালিশ শুনা ইত্যাদি গচ্ছিত দেশ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কার্যক্রমও অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অনেক সভাসমিতি ও আলোচনা বয়কট করেছে এবং তার কাজে কোনপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দিচ্ছে না। ফলে তত্ত্বা-বধানের কাজ যেভাবে চলা উচিত ঠিক তেমন ভাবে চলছে না।

কর্তব্যের স্খলন ও ত্রুটির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লাইবিরিয়া ও ইথিওপিয়া আন্তর্জাতিক আদালতে নালিশ দায়ের করেছে (নভেম্বর, ১৯৬১)। পাল্টা জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা বলেছে যে ফরিয়াদের গোড়াতেই গলদ। মামলাটি শুনবার একদম কোন এখতিয়ার আদালতটির নেই। বিষয়টি এখনও বিচারাধীন। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সৈন্যদল পাঠিয়ে নিরস্ত্র আদিম অধিবাসীদের উপর গুলি চালিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে বর্ণবৈষম্য ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (apartheid) কায়েম করার অপচেষ্টা সুরু করেছে। রক্ষণাধীন দেশে সৈন্য প্রেরণ করে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাণ্ডেটের শর্ত ভঙ্গ করেছে এবং অসহায়দের উপর গুলি ছুঁড়ে ইউ-এন-এর অনুমোদিত মানব অধিকারের মূল নীতি (U. N Charter of Human Rights) লঙ্ঘন করেছে। অত্যাচারের বহর সম্বন্ধে প্রিত্যক্ষসংবাদ সংগ্রহেরউদ্দেশ্যে ইউ-এন-এর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা বষয়ক বিশেষ কমিটিকে (U. N. Special Committee on South West Africa) দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে এমন কি নিজের রাষ্ট্রেও প্রবেশ করতে দিবার অনুমতি বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধের পরও প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্রিটিশ সরকারও কমিটিকে বেচুয়ানা-ল্যাণ্ডের পথে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় যাবার ছাড়পত্র না দিয়ে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে। অবস্থা ক্রমশঃ ঘোরাল হয়ে বিষম সঙ্কটের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কমিটি ইতিমধ্যে নিরাপত্তা-

পরিষদকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্নীতি ও দুষ্কার্যের ফলে এমন একটি আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার আশু প্রতিকার বিধান না করলে আফ্রিকায় জাতি-বিদ্বেষ-জনিত সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ ও রক্তপাত অনিবার্য।

বেশ দেখা যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক শাসনাধীন দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং তার বাইরে অন্যান্য অধীন দেশগুলির মধ্যে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সবচেয়ে বেশী নাজেহাল হতে হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগালের বর্তমান গভর্নমেণ্ট এত অন্ধ যে তারা ইতিহাসের প্রাচীরে স্পষ্ট লেখন দেখতে পাচ্ছে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতরে পুনঃ পুনঃ ধিক্কৃত হয়ে এবং বাইরে চারদিকে একটানা ছি-ছি শুনেও তাদের বিবেক জাগছে না।

আজ স্পষ্ট প্রতীয়মান যে শুধু যুক্তি দিয়ে বা অনুনয়-বিনয় করে তাদের পথে আনা যাবে না। 'এ দৈত্য নহে তেমন'। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আরও কঠোর ও দৃঢ় হতে হবে। হালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে তার উদ্ধত আপত্তিজনক আচরণের জন্য তীব্র ভৎ'সনা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আর কোনও গভর্নমেণ্ট এরূপভাবে লাঞ্ছিত হয় নাই। এতে অনেকের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি এরূপ দৃঢ়ভাবে চলে এবং ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে, তাহলে এই দুটি দুরন্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রও শীগ্‌গীরই সায়েস্তা হবে। প্রয়োজনবোধে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও ইতস্ততঃ করলে চলবে না। এরূপ দণ্ড দান রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিকার ও আয়ত্তের মধ্যে। এক কথায়, হয় তাদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি ও নির্দেশ মেনে চলতে, নয়ত প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে যেতে বাধ্য করতে হবে।[১০]

---

১০. পুস্তক রচনা সমাপ্ত হবার পর ৯।১১।৬২ তারিখে সংবাদ-পত্র পাঠে জানা গেল যে ৬ই নভেম্বর তারিখে সাধারণ সভা দক্ষিণ আফ্রিকাকে উপযুক্তরূপে শাস্তি দিবার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগণকে অনুরোধ জানিয়েছে। অনুরোধ রক্ষা

৮

তিব্বতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি একটু স্বতন্ত্রধরনের। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় সমস্যাটির সমাধান সুসাধ্য নয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে সোভিয়েট দল ও আফ্রো-এশিয়ার দলই ঔপনিবেশিকতা-বাদের কঠোরতম সমালোচক। কিন্তু সোভিয়েট ব্লকের পক্ষে কমিউনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব নয়। আফ্রো-এশিয়ার ব্লকের অধিকাংশ রাষ্ট্র কমিউনিস্ট ঘেঁষা ; সুতরাং তারাও চীনের বিরোধিতা কিংবা নিন্দাবাদ করে কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হতে অনিচ্ছুক। মৈত্রী রক্ষার আগ্রহাতিশয্যে ভারত পূর্বেই চীনকে তিব্বতের অধিরাজ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। বর্তমানে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে বিষয়টি নিয়ে উপরন্তু আর চীনকে ঘাঁটাতে চায় না। নানা কারণে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির এই ব্যাপারে তেমন গরজ দেখা যাচ্ছে না। চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয়। তজ্জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষে সমস্যাটি ভঞ্জন করা আরও দুষ্কর। আজ তিব্বতের মুক্তির প্রশ্নটি ইউ-এন-এর নানা কাজের মধ্যে তলিয়ে গেছে। কবে কোথায় কিভাবে যে প্রশ্নটির সুমীমাংসা হতে পারে কেউ তা ভাল বা নিশ্চয় করে বলতে পারছে না।

করা না করাটা সম্পূর্ণরূপে সদস্যদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত ত অনেক দিন থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, মালয়ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, পাকিস্তান প্রথমটায় এগিয়ে এসে পরে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়লা আমদানির সুবিধার জন্যে পিছিয়ে গিয়েছে। আর খুব বেশী কেউ যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডাকে সাড়া দিবে এমন মনে হয় না। সুতরাং প্রস্তাবটি কতদূর ফলপ্রদ হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রস্তাবটিতে অবশ্য এ কথাও বলা আছে যে এতে যদি কাজ না হয় তাহলে এর বিহিত করবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উপর ভার দেওয়া হবে এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বহিষ্করণের কথাটিও ভেবে দেখবার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদকে বলা হয়েছে। কিন্তু পরিষদটি যেভাবে গঠিত এবং তার নিয়মকানুন যেরূপ, তাতে স্থায়ী সভ্যদের যে কেউ যে কোন প্রস্তাব নিজের মনোমত না হলে প্রতিষেধের (veto) বলে বাতিল করে দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত হয়ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনন্দপত্রের সংশোধনের (amendment) কথাই ভাবতে হতে পারে।

পরাধীন দেশের মুক্তি-প্রচেষ্টায় এ কথাটি ভুললে চলবে না যে এমন অনেক উপনিবেশ আছে যাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাষ্ট্র হবার সম্বল নেই। ইউ-এন-ওর তালিকা-ভুক্ত অধীন দেশের মধ্যে ৩০টির জনসংখ্যা প্রত্যেকটিরই পাঁচ লক্ষের কম এবং ২১টি এমন দেশ আছে যাদের কোনটাতেই দেড় লক্ষ লোকেরও বাস নেই। স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে স্বাধীনতালাভের পর কোন কোন দেশের প্রাক্তন প্রভু-রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত থাকাই সমীচীন হবে। এরূপ সংযোজন ঔপনিবেশিকতা-বিরোধিগণ সাধারণতঃ সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকে। কিন্তু শুধু অবাস্তব আদর্শের ধুয়া ধরে এরূপ যে কোন রাষ্ট্র-সংযোগকে নামঞ্জুর করবার জন্য যদি তারা ব্যগ্র হয়, তবে ভাল করতে গিয়ে শুধু মন্দই হবে। ইউ-এন-এর সদস্যগণকে নিরপেক্ষ বিচার করে দেখতে হবে, প্রথমতঃ সংযুক্ত রাষ্ট্রের সংবিধানটি উভয়ের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও পরস্পরের সম্মতি-ক্রমে গৃহীত কিনা, এবং দ্বিতীয়তঃ দুয়ের মধ্যে যেটি অবররাষ্ট্র তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না কোথায়ও কোন ফাঁকি বা গোঁজামিল তাতে লুকান আছে।

স্বাধীনতা পেলেই সকল সময়ে মুশকিলের আসান হয় না। স্বাধীনোত্তর প্যালেস্টাইন, কোরিয়া, ইন্দোচীন, কঙ্গো প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা তার অব্যবহিত পরে এ সকল দেশে যে সমুদয় রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল বা এখনও বর্তমান আছে, তাদের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে আমরা সবাই জানি যে এরূপ পরিস্থিতির ফলে দেশগুলির কোথাও রাষ্ট্রসঙ্ঘের দায়িত্বের বা কর্তব্যের অবসান হয় নাই। কি প্যালেস্টাইন, কি কোরিয়া, কি ইন্দোচীন, কি কঙ্গো কোন স্থানেই সমস্যার দূরীকরণে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাফল্য অর্জন বা কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তার মধ্যবর্তিতায় অন্ততঃ গৃহবিপ্লবজনিত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সাময়িকভাবে নিবারিত হয়েছে। ইউ-এন-

ওর মাধ্যমে না হলেও আন্তর্জাতিক প্রযত্নের ফলেই এতদিনে লাওসের হাঙ্গামা মিটেছে। এ সকল ক্ষেত্রে ইউ-এন কেন অধিকতর সফলতা লাভ করতে পারে নাই, তার একটি বড় কারণ হচ্ছে যে গোলযোগের পেছনে রয়েছে কমিউনিস্ট ও প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রসমূহের ঠাণ্ডা লড়াইর অভিক্ষেপ।

'তিলেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায়', কবির এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে যে নিগূঢ় সত্যটি ধ্বনিত হয়েছে তারই ভাবাবেশে আমরা সহজে আর একটি রূঢ় বাস্তব সত্যকে ভুলে যাই যে স্বাধীনতা পাওয়া মানে হাতে হাতে স্বর্গ পাওয়া নয়। সাধারণতঃ পরাধীন দেশের অর্থনীতিক জীবনের বনিয়াদ তৈরি হয় প্রভুরাষ্ট্রের পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে। সেখানকার কলকারখানার জন্য সস্তায় কাঁচা মাল উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের কুঠিতে সস্তায় মজুরি খাটা, এইটে হচ্ছে উপনিবেশের অর্থনীতির মূলসূত্র। এমনিতর শোষণ-নীতির ফলে দেশটি—প্রাকৃতিক সম্পদ তার যতই অপর্যাপ্ত হোক না কেন—চিরকাল নিঃস্বই থেকে যায় এবং লোকেরা 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোনমতে 'কষ্টক্লিষ্ট' জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সদ্য স্বাধীন অনেক দেশেরই অর্থনীতিক জীবনে পূর্বোক্তরূপ ঔপনিবেশিক আধিপত্য এখনও অটুট। এই আধিপত্য অপসারণ করা সহজ নয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ব্যতীত অর্থনৈতিক দাসত্ব কখনই ঘুচবে না। বলা বাহুল্য কেবলমাত্র আইন ও ফরমান জারির জোরে বিদেশীদের তাড়িয়ে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উঠিয়ে দিয়ে বা হস্তগত করে রাতারাতি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে এবং প্রয়োজনমত বিদেশী পুঁজি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের সহিত সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে ধীরে ধীরে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তবেই নবলব্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

নূতন স্বাধীন দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে

অনবহিত নয়। তাদের সাহায্যার্থে রাষ্ট্রসঙ্ঘেও বিবিধ পরিকল্পনা ও কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলিও এ সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে সুরু করেছে। তারা বুঝতে আরম্ভ করেছে যে বর্তমান জগতে প্রতিটি দেশ প্রতিটি দেশের সহিত অর্থনীতিক জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই নূতন চেতনা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু আপশোষ শুধু এই যে এমন একটি সদুদ্দেশ্য পূরণেও তারা কূটনীতি বর্জন করতে পারছে না। সাহায্যদানের বিনিময়ে তারা প্রত্যেকেই অনুন্নত দেশগুলিতে নিজ নিজ দলগত প্রভাব বিস্তার এবং সুবিধা পেলে তাদের স্বদলভুক্ত করতে চেষ্টা করছে। পরস্পরের রেষারেষিতে সাহায্যদান ঠিক দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করে হচ্ছে না। ফলে তার অপব্যবহার ও অপচয়ও যথেষ্ট হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য দানের সমস্ত প্রস্তাব, পরিকল্পনা ও অর্থ রাষ্ট্রসঙ্ঘে কেন্দ্রিত হয়ে তথায় যথাযথ সংশ্লেষণের পর সেখান থেকে তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে যথাযোগ্য-ভাবে পরিবেশিত হলে প্রভূততর উপকার সাধিত হতে পারত। কিন্তু আজকের দিনে দুনিয়ার যেরূপ হাল এবং পরিস্থিতিও যেরূপ ঘোরাল তাতে এরূপ সম্ভাবনা অলীক কল্পনা মাত্র।

বিশেষ একটি দুঃখের বিষয়, বিদেশী শাসন মুক্ত হওয়ার পরে অধিকাংশ দেশেই জনগণের মৌলিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত হয় নাই। কোথায়ও সূচনা থেকে, আবার কোথায়ও পরে আকস্মিক বিপর্যয়ের ফলে এরূপ ঘটেছে। আজ মিশর, সিরিয়া, ইরাক, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি দেশে জঙ্গী শাসনের দৌরাত্ম্যে এবং ইন্দোনেশিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশে একনায়কত্বের স্বৈরাচারে সাধারণ মানুষ তার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত। এ আজাদি ঝুটা ও আশার ছলনা বলেই তার কাছে মনে হচ্ছে। বিদেশী শাসন থেকে ছাড়া পাওয়ার প্রথম

আনন্দ তার অন্তর থেকে যেন একেবারে উবে গেছে। অবশ্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নটি অনেক তথা-কথিত গণতান্ত্রিক দেশেও অল্পবিস্তর বর্তমান। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে এই অধিকারের অভাব সুস্পষ্ট; কিন্তু তার রাজনীতি মার্কসবাদের আদর্শের উপর রচিত এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধরনের। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে তার গুণাগুণ বিচার না করাই বিধেয়। পরন্তু আর্থিক সাম্যের অভাবহেতু শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রের (Political democracy) ভিত্তিতে তৈরী অট্টালিকায় নীচের তলার লোকেদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা অনেক স্থলেই প্রহসন মাত্র। একমাত্র সমাজবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতেই সমস্যাটির সুষ্ঠু মীমাংসা হতে পারে বলে প্রতীত হয়। সিদ্ধান্তটি বিতর্কমূলক বটে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্যও নয়, এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে নিতান্তই আনুষঙ্গিকক্রমে। যাহোক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান বাস্তব জগতের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন দেখি যে জাতিবর্ণ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ সর্বত্র জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যস্বরূপ গণ্য হয়েছে,[১১] তখন তাকে দিগন্তে রবিরেখার মতই মনে হয় এবং হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই মহৎ উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ করবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের অদ্যাপি তেমন কোন চেষ্টা লক্ষ্য না করে হরিষে বিষাদ জন্মে।

একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির বা সম্প্রদায়ের অধিকার সীমিত ও লঙ্ঘিত হয়েছে, এও আর একটি দুঃখের কথা। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে—অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে—বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রশ্নটি উঠেছিল। বর্তমানে ব্রহ্মদেশে শান, কারেন

---

১১. সনন্দপত্রের ১ম ধারার ৩য় উপধারা দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি উপজাতির, পাকিস্তানে ফাকতুনদের, ভারতে নাগাদের, ইরাকে কুর্দীদের পৃথক্ রাষ্ট্র গঠনের দাবিও অনুরূপ। যেখানে রাষ্ট্রসত্তার ন্যূনতম উপাদানের অভাব সেখানে অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের সঙ্কল্প অতিশয় অবাস্তব। এরূপ দাবি গ্রাহ্য করা যেতে পারে না। কিন্তু বৃহত্তর রাষ্ট্রের ভিতরও এরূপ সুব্যবস্থা হতে পারে যাতে প্রত্যেক উপজাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী অন্যদের সহিত সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার পেয়ে স্বীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করতে পারে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্তমান সাম্যবাদের যুগেও কোন কোন রাষ্ট্রে জাতি বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ করা হয়ে থাকে। যেমন আমেরিকার সংবিধানে নিগ্রোদের এবং পাকিস্তানের সংবিধানে হিন্দুদের কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকদের সহিত অপাঙক্তেয় করে রাখা হয়েছে।

উপর্যুক্ত রূপ বৈষম্যমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত অন্য আরও রাষ্ট্রেও পাওয়া যাবে কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাধিক কুখ্যাত হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে বহিরাগত সংখ্যালঘু শ্বেতজাতিই গায়ের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় আদিম দেশবাসীদের মৌলিক অধিকার হরণ করেছে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে? এই ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য আফ্রো-এশিয়া ব্লকের তরফে ইউ-এন-ওতে জোরাল দাবি উত্থাপিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে সেখানে প্রতিকারকল্পে কোনরূপ উদ্যমের সূচনামাত্র সাম্রাজ্যবাদিগণ ও তাদের অনুচরবৃন্দ এরূপ প্রয়াসকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বে-আইনী হস্তক্ষেপ বলে বাধা দিতে সঙ্কোচ বোধ করছে না। যে উপধারাটির সূত্র ধরে তারা প্রতিকারের পথ রোধ করতে চেষ্টা করছে, তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে এ কথাও বলা আছে যে যেখানে আন্তর্জাতিক শান্তির প্রশ্ন জড়িত সেখানে নিষেধটি প্রযুজ্য নয়।[১২]

১২. সনদের ১ম পরিচ্ছেদের ২য় ধারার ৭ম উপধারা দ্রষ্টব্য।

তামাম দুনিয়ায় শান্তি কায়েম রাখাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাথমিক লক্ষ্য। আবার এ কথাও অবধারিত সত্য যে যতদিন জগতের প্রতিটি জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী নিজ নিজ রাষ্ট্রে সমব্যবহার ও আত্মবিকাশের স্বাধীনতা না পাবে, ততদিন আন্তর্জাতিক শান্তিরও নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবিদ্বেষ-নীতির নির্লজ্জ নিপীড়নের ফলে বিশেষ করে আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে যেরূপ বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য লক্ষ্যগোচর হচ্ছে, তাতে যে কোন মুহূর্তে দাবানল জ্বলে উঠতে পারে। অতএব এ বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিঃস্পৃহ ও নিরুদ্যম থাকতে পারে না, থাকেও নি। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রবেশ নিষেধ এই অজুহাতে যেমন পর্তুগাল এঙ্গোলাতে জুলুমবাজির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায় নাই, তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকাও ঐ একই ওজর আপত্তি তুলে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ উভয়েই তার কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে নীরব ও নিক্রিয় হয়ে বসে নাই। এ বিষয়ে যেরূপ নির্ভীক ও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ আবশ্যক, সবেমাত্র তার উপক্রম হয়েছে। এই আশাপ্রদ সূচনাটির ভবিষ্যৎ গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে নিশ্চয় করে এখনও কিছু বলা যায় না। কারণ অদ্যাবধি কেবল সঙ্কল্পই গ্রহণ করা হয়েছে, সঙ্কল্প সাধনের কার্যকরী পন্থা বিশেষ কিছু স্থির করা হয় নাই। যুক্তি ও অনুরোধ বিফল হলে, কার্যোদ্ধারের জন্য কি কি উপায়ের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে সনন্দপত্রের সপ্তম কাণ্ডে তা সবিস্তারে লিখিত হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা, যাতায়াত ও সংবাদের আদান-প্রদান বন্ধ করা ইত্যাদি নানাভাবে দেশটিকে কোণঠাসা করার চেষ্টা থেকে আরম্ভ করে সশস্ত্র দমন পর্যন্ত বহুবিধ উপায়ের নির্দেশই তাতে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ব্যাপারে আমরা দেখেছি দক্ষিণ আফ্রিকার দমনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখনও তেমন বদ্ধপরিকর নয়। উল্লিখিত

কঠোর ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনের প্রয়োজন হলে সদস্যদের অনেকের সক্রিয় সহায়তা লাভের আশাও অতিশয় অনিশ্চিত।

বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে ইতিহাস আজ টেনে দিয়েছে ভৌমিক সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক দাসত্বের উপর কালান্তরের যবনিকা। কিন্তু অর্থনীতি ও কূটনীতির চক্রে এক দেশের উপর আর এক দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ ও প্রভাব এখনও যথেষ্ট। রাজনৈতিক গগনের বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক, আমেরিকা ও রাশিয়া, উভয়ের ছায়াতলে বিস্তর দেশ উপগ্রহের মত বিরাজমান। তাদের বাহ্য স্বাধীনতা অন্তঃসারশূন্য। এ যেন ঔপনিবেশিকতারই একটি নূতন সংস্করণের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাসের কি বিচিত্র তির্যক্ গতি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যমণ্ডিত গৌরবোজ্জ্বল বর্তমানটি ঘিরে আজ আসন্ন মেঘের কাল ছায়া!

আমেরিকা ও রাশিয়া দুইই তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রদের নিয়ে হরেক জোট বেঁধেছে। যথা রাশিয়ার নেতৃত্বে ওয়ারস গোষ্ঠী এবং অপর পক্ষে ন্যাটো (Nato), সিয়াটো (Seato), সেণ্টো (Cento) গয়রহ। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দলে অন্য রাষ্ট্রদের সাধ্যমত ভিড়াতে চেষ্টা করছে। এরূপ দল বা সঙ্ঘ গঠন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংবিধানের অনুমোদিত বটে[১৩] কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য ও নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষার একটা বাধ্যবাধকতাও তার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। কার্যতঃ তা হচ্ছে না। কেননা অন্যোন্য বিরোধী দল দুটি নিজেদের মধ্যে কেবলই ঘোঁট পাকাচ্ছে এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহে ও বিদ্বেষে ঠাণ্ডা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমাগত রণসম্ভার বৃদ্ধি করে সারা দুনিয়ার শান্তি নষ্ট করছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য এমনিভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উভয়ের দ্বন্দ্ব কলহে রাষ্ট্রসঙ্ঘের করণীয় কাজও যথাযথরূপে সম্পন্ন হতে পারছে না।

ভবিষ্যৎ যতই মেঘাচ্ছন্ন হোক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জই অন্ধকারের

১৩. সনদের ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অন্তরালে আশার আলো। আদিতে মাত্র ৫১টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়ে তার সদস্যসংখ্যা বাড়তে বাড়তে হালফিল ১০৮টিতে[১৪] এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের বেশির ভাগই আবার ইদানীন্তন কালে বিদেশী শাসনমুক্ত; সুতরাং একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং অনেকটা সমভাবাপন্ন। নানা বিষয়ে মতবৈষম্য তাদের মধ্যেও প্রচুর আছে কিন্তু পরাধীন জাতির মুক্তিকামনায় তারা সমপ্রাণ ও একক্রিয়। তাদের সংযোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দেহে নিঃসন্দেহে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। আশা করা যেতে পারে তাদের মিলিত চাপে ঝানু সাম্রাজ্যবাদিগণ ক্রমে ক্রমে কাবু হয়ে পড়বে এবং তাদের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাবে। অতএব অনাগতকালে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সহায়তা যারা পরাধীন তাদের পক্ষে সুলভ হবে এবং তাতে তাদের স্বাধীনতা লাভের পথ আরও সুগম হবে। হয়ত প্রত্যেক জাতির নবলব্ধ স্বাধীনতার অর্থনীতিক বনিয়াদও দৃঢ় হবে কিন্তু তার অকৃত্রিমতা সুরক্ষিত হবে কিনা গ্রন্থের উপসংহারে এই প্রশ্ন-চিহ্নটি মুদ্রিত হয়ে রইল।

---

১৪. বর্তমান সংখ্যা ১১১।

পরিশিষ্ট

(ক)

পরিদর্শন-তালিকা

(১৯৪৭-১৯৬০)

স্থায়ী সদস্য ঃ—	১*	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	মোট বার
অস্ট্রেলিয়া		√				√			√			√					৪
বেলজিয়াম	√		√			√				√	√				√		৬
চীন		√		√		√				√					√		৫
ফ্রান্স		√		√			√					√		√			৫
ইটালি															√		১
নিউজিল্যাণ্ড					√			√					√			√	৪
ইউ. এস্. এস্. আর																	০
সংযুক্ত রাজ্য				√			√				√			√			৪
সংযুক্ত রাষ্ট্র	√		√		√			√	√	√			√		√		৮
নির্বাচিত সদস্য ঃ—																	
আর্জেন্টিনা																	০
ব্রহ্মদেশ												√			√		২

চিলি	√																১
কোস্টারিকা		√															১
ডমিনিকান সাধারণতন্ত্র					√		√										২
এল স্লেলভেডর						√		√									২
গুয়াটেমালা											√						১
হাইতি										√		√	√				৩
ভারত								√	√		√		√	√			৫
ইরাক			√														১
মেক্সিকো			√														১
প্যারাগুয়ে																√	১
ফিলিপাইনস				√													১
সিরিয়া							√		√								২
থাইল্যাণ্ড					√												১
ইউ. এ. আর														√		√	২

* প্রথম বারে পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনজন সদস্য ; অন্যান্য সববারেই চারজন। সংখ্যাগুলির সাঙ্কেতিক অর্থের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সঙ্কেতের অর্থ

গচ্ছিত দেশের নাম	পরিদর্শনের বৎসর
১। পশ্চিম স্যামোয়া	১৯৪৭ খ্রীঃ
২। পূর্ব আফ্রিকা	১৯৪৮ "
৩। পশ্চিম আফ্রিকা	১৯৪৯ "
৪। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ	১৯৫০ "
৫। পূর্ব আফ্রিকা	১৯৫১ "
৬। পশ্চিম আফ্রিকা	১৯৫২ "
৭। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ	১৯৫৩ "
৮। পূর্ব আফ্রিকা	১৯৫৪ "
৯। ফরাসী ও ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড	১৯৫৫ "
১০। ফরাসী ও ব্রিটিশ ক্যামেরুন	১৯৫৫ খ্রীঃ
১১। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ	১৯৫৬ "
১২। পূর্ব আফ্রিকা	১৯৫৭ "
১৩। পশ্চিম আফ্রিকা	১৯৫৮ "
১৪। পশ্চিম স্যামোয়া	১৯৫৯ "
১৫। নারু, নিউগিনি, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ	১৯৫৯ "
১৬। পূর্ব আফ্রিকা	১৯৬০ "

(খ)

অধীন দেশের তালিকা

অষ্ট্রেলিয়ার অধীন ঃ প্যাপুয়া।

ফ্রান্সের অধীন ঃ (১) ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা (মরিটানিয়া, সেনিগাল, ফরাসী গিনি, আইভরি কোস্ট, ডাহোমী, উচ্চ ভল্টা, সুদান ও নাইজার)।

(২) ফরাসী নৈরক্ষিক আফ্রিকা (গাবন, মধ্য কঙ্গো, ইউবাঙ্গি-শারি ও চাড)।

(৩) ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড।

(৪) মাদাগাস্কার ও সেণ্টমেরী, কমোরো, এমস্টারডাম, সেণ্ট পল প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংশ্লিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ।

(৫) ফরাসী ওসেনিয়া (দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কোয়েসাস, সোসাইটি, লিওয়ার্ড, গ্যাম্বিয়ার টুবুয়াই এবং টুয়ামোটু দ্বীপপুঞ্জ)।

(৬) ইন্দোচীন (কোচিন চীন, কাম্বোডিয়া, আন্নাম, টংকিং ও লাওস)।

(৭) ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থান (পণ্ডিচেরী, ইয়ানন, কারিকল, মাহে ও চন্দননগর)।

(৮) নিউ ক্যালিডোনিয়া এবং কুনিয়ে, লয়েল্টি, হিউয়ন, ওয়ালিস ও ফুটুনা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ।

(৯) সেণ্টপিয়ের ও মিকেলন।

(১০) মরক্কো।

(১১) টিউনিসিয়া।

(১২) মার্টিনিক।

(১৩) গোয়াদেলুপ ও সংশ্লিষ্ট মেরিগেলাণ্ট, ডেসিরাড, লেসেণ্ট, সেণ্ট বার্থেলিমি ও সেণ্ট মার্টিনের অংশ।

(১৪) ফরাসী গিয়ানা।

(১৫) রি-ইউনিয়ন।

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুগ্ম শাসনাধীনঃ নিউ হিব্রাইডিজ।

বেলজিয়ামের অধীন ঃ কঙ্গো।

ডেনমার্কের অধীন ঃ গ্রীনল্যাণ্ড।

নেদারল্যাণ্ডসের অধীন ঃ (১) নেদারল্যাণ্ডস ইণ্ডিজ (নিউগিনি ও জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, লম্বক, রিও, বালি, ব্যাংকা, মোলাক্কাস, টাইমর, বিলিটন প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ)।

(২) সুরিনাম (৩) কিউরেসো।

নিউজিল্যাণ্ডের অধীন ঃ (১) কুক দ্বীপপুঞ্জ (২) টোকেলাও দ্বীপপুঞ্জ।

যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ঃ (১) আলাস্কা (২) স্যামোয়া (৩) গুয়াম (৪) হাওয়াই (৫) পানামা খাল অঞ্চল (৬) পোর্টো রিকো (৭) ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ।

যুক্তরাজ্যের অধীন ঃ— (১) বারবেডোজ (২) বার্মুডা (৩) ব্রিটিশ গিয়ানা (৪) ব্রিটিশ হণ্ডুরাস (৫) ফিজি দ্বীপপুঞ্জ (৬) গাম্বিয়া (৭) জিব্রাল্টার (৮) লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ (৯) মরিসাস (১০) সেণ্ট লুসিয়া (১১) জাঞ্জিবার (১২) এডেন (১৩) বাহামা দ্বীপপুঞ্জ (১৪) বাসুতোল্যাণ্ড (১৫) বেচুয়ানাল্যাণ্ড (১৬) ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড (১৭) ব্রুনেই (১৮) সাইপ্রাস (১৯) ডমিনিকা (২০) ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ (২১) গোল্ডকোষ্ট (২২) গ্রেণাডা (২৩) হংকং (২৪) জামাইকা (২৫) কেনিয়া (২৬) মালয় (২৭) মাল্টা (২৮) নাইজিরিয়া (২৯) উত্তর বোর্ণিও (৩০) উত্তর রোডেশিয়া (৩১) নিয়াসাল্যাণ্ড (৩২) সেণ্ট হেলেনা ও সংশ্লিষ্ট এসেন্সন ও ট্রিষ্টান ডা কুনিয়া দ্বীপ (৩৩) সেণ্ট ভিন্সেণ্ট (৩৪) সারাওয়াক (৩৫) সেসেল্স (৩৬) সিয়েরা লিওন (৩৭) সিঙ্গাপুর (৩৮) সোয়াজিল্যাণ্ড (৩৯) ট্রিনিডাড ও টোবাগো (৪০) ইউগাণ্ডা (৪১) পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপ (জিলবার্ট ও এলিস দ্বীপপুঞ্জ, ব্রিটিশ সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও পিটক্যার্ণ দ্বীপপুঞ্জ)

(গ)

নিম্নলিখিত দেশগুলির নাম রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বায়ত্তশাসনহীন দেশের তালিকা থেকে তাদের পরিচালক-রাষ্ট্রেরা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। পাশে পাশে তাদের পরিচালক-রাষ্ট্রদের নাম লিখে এবং বন্ধনীর মধ্যে যে কারণে তাদের নাম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল অতি সংক্ষেপে তা বলে দেওয়া হল। প্রত্যাহারের তারিখও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা হল।

দেশ (Territory)	পরিচালক-রাষ্ট্র (Administering Authority)
মধ্য আফ্রিকা	
ফরাসী নৈরক্ষিক আফ্রিকা	ফ্রান্স—(আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন-লাভ, ১৯৫৭)
পূর্ব আফ্রিকা	
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	ঐ
ভারত মহাসাগর	
কমোরো দ্বীপপুঞ্জ	ফ্রান্স—(আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত শাসন-লাভ, ১৯৫৭)
মাদাগাস্কার দ্বীপ	" "
রি-ইউনিয়ন দ্বীপ	" (ফরাসী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি ও সমীকরণ, ১৯৪৭)
পশ্চিম আফ্রিকা	
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	ফ্রান্স—(গিনির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-লাভ, ১৯৫৮ এবং অন্যান্য দেশ-গুলির আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন-লাভ, ১৯৫৭)
গোল্ড কোস্ট	যুক্তরাজ্য—(স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-লাভ, ১৯৫৭)
উত্তর আফ্রিকা	
মরক্কো	ফ্রান্স—(স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যলাভ, ১৯৫৭)
টিউনিসিয়া	ঐ

দেশ (Territory)	পরিচালক-রাষ্ট্র (Administering Authority)
ক্যারিবিয়ান সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর (পশ্চিম)	
কুরাসাও দ্বীপ	নেদারল্যাণ্ডস—(আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসনলাভ, ১৯৫১)
স্যান্ট পিয়ার দ্বীপ	ফ্রান্স—(ফরাসী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি ও সমীকরণ, ১৯৪৭)
মিকেলন দ্বীপ	ঐ
ফরাসী গিয়ানা	ঐ
গোয়াদেলুপ দ্বীপপুঞ্জ	ঐ
মার্টিনিক দ্বীপ	ঐ
পানামা খাল অঞ্চল	যুক্তরাষ্ট্র—(দেশটি কি পর্যায়ের তা অনুশীলন করা হচ্ছে, ১৯৪৭)
পোর্টোরিকো	" (সংশ্লিষ্ট জনরাষ্ট্রে উন্নীত, Associate Common-wealth, ১৯৪৭)
সুরিনাম	নেদারল্যাণ্ডস—(আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসনলাভ, ১৯৪৭)
এশিয়া	
ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থানসমূহ	ফ্রান্স—(ভারতের নিকট হস্তান্তর, ১৯৪৮)
ইন্দোচীন	" (কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎ-নামের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-লাভ, ১৯৫৫)
মালয়	যুক্তরাজ্য—(স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যলাভ, ১৯৫৭)
ইন্দোনেশিয়া	নেদারল্যাণ্ডস—(স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-লাভ, ১৯৫০ ; ডাচ ইণ্ডিস-এর অংশ নিউগিনিকে ইন্দোনেশিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করে নূতন একটি স্বায়ত্তশাসনহীন দেশরূপে গণ্য করা হল।)

দেশ (Territory)	পরিচালক-রাষ্ট্র (Administering Authority)
প্রশান্ত মহাসাগর	
ওসেনিয়াতে ফরাসী অধিকৃত দ্বীপসমূহ	ফ্রান্স—(ফরাসী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি ও সমীকরণ, ১৯৪৭)
হাওয়াই	যুক্তরাষ্ট্র—(অঙ্গীভূত রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত, ১৯৫৯)
নিউ ক্যালিডোনিয়া	ফ্রান্স—(ফরাসী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি ও সমীকরণ, ১৯৪৭)
অন্যান্য অঞ্চল	
আলাস্কা	যুক্তরাষ্ট্র—(অঙ্গীভূত রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত, ১৯৫৯)
গ্রীনল্যাণ্ড	ডেনমার্ক—(রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি, ১৯২৩)

(ঘ)

[অধীন দেশের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, ১৯৪৫-৫৬]

অধীন দেশ	প্রভুরাষ্ট্র	জনসংখ্যা	স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল ও স্বাধীনোত্তর রাষ্ট্রের স্বরূপ
এশিয়া			
ব্রহ্মদেশ	যুক্তরাজ্য	১৬,০০০,০০০	জানুআরি, ১৯৪৮ ; সাধারণতন্ত্র।
সিংহল	"	৫,৯০০,০০০	ফেব্রুআরি, ১৯৪৮ ; ব্রিটিশ রাষ্ট্রমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত স্বাধীন রাষ্ট্র।
ফরমোসা (তাইওয়ান)	জাপান	৫,৮০০,০০০	১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের পরাজয়ের পর স্বাধীন চীনের অঙ্গীভূত ; ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর দ্বীপটিতে চীনের ন্যাসনলিস্ট গভর্নমেণ্ট (কুয়োমিং-টাং সরকার) স্থানান্তরিত।
ভারতে ফরাসী-অধিকৃত স্থান	ফ্রান্স	৩২৩,০০০	১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতরাষ্ট্রে হস্তান্তরিত ও অন্তর্ভুক্ত।
ভারত	যুক্তরাজ্য	৩৫০,০০০,০০০	আগস্ট, ১৯৪৭ ; ভারত ও পাকিস্তান দুটি সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত, উভয়েই ব্রিটিশ রাষ্ট্রমণ্ডলের সদস্য।
ইন্দোচীন	ফ্রান্স	২৩,৬০০,০০০	কাম্বোডিয়া, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও উত্তর ভিয়েৎনাম এই চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুটিতে রাজতন্ত্র এবং শেষোক্ত দুটিতে সাধারণতন্ত্র বিদ্যমান। উত্তর ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। ১৯৪৬ খ্রীঃ থেকে প্রথমোক্ত তিনটি ফরাসীর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র এবং শেষোক্তটি বিদ্রোহী স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বিদ্যমান ছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভাতে আপসমীমাংসার (Geneva Agreement) পর স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত।

অধীন দেশ	প্রভু রাষ্ট্র	জনসংখ্যা	স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল ও স্বাধীনোত্তর বর্তমান অবস্থা।
ফিলিপাইনস	যুক্তরাষ্ট্র	১৬,২০০,০০০	জুলাই, ১৯৪৬ ; সাধারণতন্ত্র।
কোরিয়া	জাপান	২২,০০০,০০০	মে, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের পরাজয় স্বীকারের পর স্বাধীনতালাভ এবং ৮ মাস পরে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। উভয় রাষ্ট্রেই সাধারণতন্ত্র(Republic) বিদ্যমান ; তন্মধ্যে প্রথমটিতে কমিউনিস্ট সরকার অধিষ্ঠিত।
মাঞ্চুরিয়া	"	৩৭,০০০,০০০	জাপানের পরাজয়ের পর স্বাধীন চীনের অঙ্গীভূত।
নেদারল্যাণ্ডস ইণ্ডিস	নেদারল্যাণ্ডস	৬৯,৪০০,০০০	জানুআরি ১৯৫০ ; পশ্চিম নিউগিনি বাদে বাকী অংশে ইন্দোনেশিয়া নামে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।
পশ্চিম গোলার্ধ			
ফরাসী গিয়ানা	ফ্রান্স	৪০,০০০	১৯৪৬ ; ফরাসী ইউনিয়নের অঙ্গীভূত।
গ্রীনল্যাণ্ড	ডেনমার্ক	১৯,০০০	১৯৫৩ খ্রীঃ, ডেনমার্কের অঙ্গীভূত।
গোয়াদেলুপ	ফ্রান্স	৩০০,০০০	১৯৪৬ ; ফরাসী ইউনিয়নের অঙ্গীভূত।
মার্টিনিক	"	২৪৭,০০০	" "
নেদারল্যাণ্ডস এ্যণ্টিলিজ	নেদারল্যাণ্ডস	১০০,০০০	ডিসেম্বর, ১৯৫৪ ; আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসনপ্রাপ্ত রাষ্ট্র।
নেদারল্যাণ্ডস গিয়ানা	"	৩৩০,০০০	ঐ ঐ
পোর্টোরিকো	যুক্তরাষ্ট্র	১,৮০০,০০০	জুলাই, ১৯৫৩ ; ঐ (যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট)
মধ্যপ্রাচ্য			
লেবানন	ফরাসী ম্যাণ্ডেট	১,১০০,০০০	১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র ঘোষণা. ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্যতঃ ম্যাণ্ডেটের অবসান, ডিসেম্বর ১৯৪৫এ ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত এবং ১৯৪৭ এর মাঝামাঝি পার্লামেণ্টের নির্বাচন।

অধীন দেশ	প্রভুরাষ্ট্র	জনসংখ্যা	স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল ও স্বাধীনোত্তর রাষ্ট্রের স্বরূপ
লিবিয়া	ইটালি	৯০০,০০০	ডিসেম্বর, ১৯৫১ ; রাজতন্ত্র।
মরক্কো	ফরাসী আশ্রিত রাজ্য	৬,৫০০,০০০	মার্চ, ১৯৫৬ ; রাজতন্ত্র।
প্যালেস্টাইন	ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট	১,৫০০,০০০	মে, ১৯৪৮ ; প্রধান অংশে ইস্রায়েল নামে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
সুডান	ইঙ্গ-মিশর যুগ্ম শাসন (Anglo-Egyptian Condominium)	৩,৫৫৩,০০০	জানুআরি, ১৯৫৬ ; সাধারণতন্ত্র, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন।
ট্রান্স-জর্ডান	ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট	৩০০,০০০	মার্চ, ১৯৪৮ ; রাজতন্ত্র, নূতন নাম জর্ডান।
সিরিয়া	ফরাসী "	২,৫০০,০০০	লেবানন দ্রষ্টব্য।
টিউনিসিয়া	ফরাসী-আশ্রিত রাজ্য	৩,২৩১,০০০	মার্চ, ১৯৫৬ ; রাজতন্ত্র।
অন্যান্য			
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ল্যাব্রেডর	যুক্তরাজ্য	২৯০,০০০	ক্যানাডার সহিত সমামেল গঠন।
রি-ইউনিয়ন	ফ্রান্স	২০০,০০০	১৯৪৬ ; ফরাসী ইউনিয়নের অঙ্গীভূত।
		৫৬৯,২৮৩,০০০ (মোট জনসংখ্যা)	

নির্দেশিকা

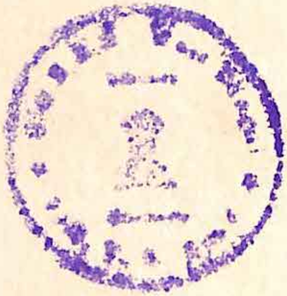
ফ

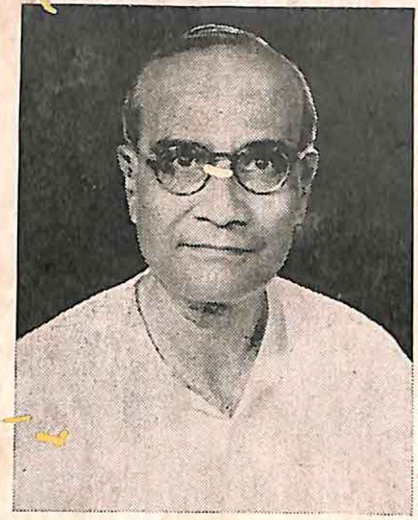
ব

১০

নির্ঘণ্ট

[ইংরেজিতে লেখা নাম ও শব্দের]





ডক্টর পরিমল রায় ১৯২৩ সালে কৃতিত্বের সহিত ধনবিজ্ঞানে এম. এ. পাস করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩১ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জনের অনতিকাল পরে বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে প্রিন্সিপালের কাজে যোগদান করেন। বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যক্ষতার পর ১৯৫০ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকর্তা (Director of Public Instruction) হন এবং ১৯৫৭ সালে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি শিক্ষা, অর্থ, পল্লী-উন্নয়ন ইত্যাদি বিবিধ সরকারী স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটি বা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯১৫-১৬ সালে স্কুলে পড়িবার সময় হইতে তিনি শিশুদের মাসিক পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তখনকার শিশুপাঠ্য অনেক-লেখা এবং কলেজে শিক্ষা-সমাপনের অব্যবহিত পরে লিখিত "পল্লী-পরিচয়," "কুটির-শিল্প" ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধ বাংলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপা হয়। তাঁহার অর্থনীতি-সংক্রান্ত ইংরেজি সন্দর্ভগুলি Calcutta Review ও Asiatic Review (London) এই পত্রিকা দুইটিতে ১৯২৯-৩২ সালে ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়। ১৯৩৪ সালে তাঁহার রচিত "India's Foreign Trade Since 1870" এই গবেষণামূলক পুস্তকটি লণ্ডনে George Routledge & Sons কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বইটি অধ্যাপক Lionel Robbins (অধুনা লর্ড) প্রমুখ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌গণের এবং Economist, Economic Journal, Manchester Guardian, Statesman প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী বহু পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে তিনি নিউইয়র্কে U. N. Secretariatএ বিশেষ গুরুদায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত কতিপয় অধীন দেশের বিশেষ বিশেষ সমস্যা লইয়া নিবন্ধাদি রচনা করেন। বর্তমান গ্রন্থটিও প্রধানতঃ তাঁহার তথাকার অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কে লেখকের আরও একটি বই প্রস্তুতি-অধীন। অদ্যাপি তিনি Modern Review, Amrita Bazar Patrika ইত্যাদি মাসিক ও দৈনিকে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন।